

শ্রীশামুক

মহালয়া
১৩৪৮

দেব সাহিত্য-কুটীর
ঝামাপুকুর লেন, কলিকা

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫, বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত





দাম দশ আনা

প্রিণ্টার—এস. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪নং ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা

শ্রীপ্রদীপকুমার সেনকে—



সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ দড়াম করে পিস্তলের আওয়াজ—একবার,—দু'বার।

—১০১ পৃষ্ঠ

ছেলেধরা সার্কাস্

এক

টেনী-লব-কুশ-বেবী

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘরের ভিতর ! দরজার বাইরে উঠানের দিকে হারিকেন জ্বালা। ঘরে আব্ছা আলো আব্ছা আঁধার। ভীম দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ—পাশবালিশ নিয়ে। ধপাধপ্ শব্দ ও চাপা হাসি। বেশীক্ষণ চেপে রাখা গেল না, যুদ্ধের রুদ্রমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করলো ভীষণ হুঙ্কারে।

উঠান থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে এল, আলো আড়াল করে দাঁড়ালো ছায়ামূর্ত্তি। যোদ্ধারা আন্দাজ পেয়েই শুয়ে পড়েছে মৃতবৎ, যে যে অবস্থায় ছিল ;—নড়ন-চড়ন—নট-কিচ্ছু।

নিস্তব্ধ ঘরকে উদ্দেশ করে টেনী মুখস্থ বলে গেল,—লব, কুশ, বেবী, মা বললেন, রুটি সেঁকতে সেঁকতে যদি উঠে আসি ত' কারুকে আস্ত রাখবো না।

কোন উত্তর পেল না, টুঁ শব্দও না—কুরুক্ষেত্র নিথর নিস্পন্দ।

বিষম হাসি পাচ্ছিল, টেনী হাসলো না ; পা টিপে টিপে এগিয়ে এল বিছানার উপর। মাঝখানে গিয়ে ঝুঁকেছে নিরীক্ষণ করে দেখবার

আশায়,—ব্যস্, আর কি। ধপাধপ্ সুরু হ'ল আবার যুদ্ধ—এবারে টেনী শুদ্ধ।

বোঝা যায় না কে কোন্ দিকে। সকলেই সকলকে সমান বিক্রমে আক্রমণ করছে। একটা ছেঁড়া বালিশের তুলো উড়ে উড়ে ঘর আরো অন্ধকার করে দিল। সব নীচে কুশ, তার উপর এক বালিশ; তার উপর বেবী ও বেবীর উপর আরেকটি বালিশ—এই অদ্ভুত সিংহাসনে বসে লব প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাতে লাগলো, ভাবটা এই যে, টেনীকে হারালেই যুদ্ধ-জয় সুনিশ্চিত। হাতের বালিশ ফস্কে ঠিক্‌রে বেরিয়ে গেল—হারিকেন যেন বুক পেতে নিল—কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ, কেরোসিনের গন্ধ—আলো দপ্ দপ্ করে নিভে গেল। মা তখন দরজার কাছে এসে পৌঁচেছেন।

আবার সব একেবারে চুপ্। মাও কি করবেন কয়েকমিনিট ভেবে পেলেন না। হঠাৎ বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাবা ডাকলেন,—টেনী, টেনী দরজা খুলে দে শীগ্‌গির। মা রান্নাঘর থেকে আলো নিয়ে দরজা খুলতে গেলেন।

এরপর মিনিট দশেক যা চললো, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তা নয়—বকুনী-পর্ব্ব বলা যায়—মহাভারতে এর কথা লেখা নেই। মাথা নীচু করে শুনতে হ'ল অনেক কথা। তার সারাংশ এই যে, এরকম ছেলেমেয়ে ঘরে রাখা বিপজ্জনক—কোন্‌দিন যে সমস্ত বাড়িতে আগুন লাগাবে না তা কে বলতে পারে? আসছে নতুন বছরের সঙ্গে সকলকে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দেওয়া হবে; চোখের আড়ালে যা খুশী করুক গে।

বেবী ফুঁপিয়ে কাঁদলো, লবকুশের চোখ শুখনো রইল না,

টেনী সামলে ছিল অনেকক্ষণ, কি একটা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড এক 'চোপ' শুনে হু-হু করে কেঁদে ফেললো। এরপরে সকলকে চোখ মুছে বাইরের ঘরে গিয়ে আলোর চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়তে হ'ল— ভারী গলার কোরাসে। খাবার সময় চুপ্‌চাপ শান্তশিষ্টের মত সব খেল যেন অন্য মানুষ এরা! যে যে জিনিষ ভালবাসে, না চাইতে বেশী করে পেল। মা যেন একটু বেশী মিষ্টি করে বললেন,—চুপ্‌চাপ গিয়ে ঘুমিয়ে পড়গে সব।

টেনীর আধঘুম এসেছে, লব গড়িয়ে এসে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললো ;—কাল পাহাড়ে যাওয়া হবে ?—

—না।

—কালকে ছুটী যে !

—আচ্ছা।

লব নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে লেপটা কান পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

শেখপুরা দক্ষিণ বিহারে ছোট ষ্টেশন। অর্দ্ধচন্দ্রের আকৃতি পাহাড় ছোট সহরটিকে মায়ের মত বুকে জড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখা যায়—শুধু রেলের লাইন, হলদে রংএর একতালা ষ্টেশন ও একটু দূরে কয়েকখানি দোকানঘরের সারি। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ওপারে মেলে বাড়ি-ঘর, দোকান-বাজার, স্কুল-আদালত সব কিছুই। পাহাড় খুব উঁচু নয়, বেশী চওড়াও না কিন্তু তবুও পাহাড় ত'! কত রকমের পাথরের তৈরী। পূব সীমানায় যেখানে বড় দীঘিতে শেষ

হয়েছে—কাল কুচ্‌কুচে পাথর ঠিক আমেরিকার বাড়ির মত চৌকো গড়ন। এখানে ধোপারা হিস্ হিস্ শব্দ করে আছড়ে কাপড় কাচে,—অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আবার টেনীদের বাড়ির মাথার উপর উটের পিঠের মত ফুলে উঠেছে বাদামী রংএর পাহাড়। এর উপর থেকে সমস্ত শেখপুরা একসঙ্গে দেখা যায় দীঘির সবুজ জলটুকু পর্য্যন্ত। অন্য দিকে রেলের লাইন এঁকে বেঁকে কতদূর চলে গেছে! শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না, ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। এ ছাড়া চারিদিকে দিগন্তপ্রসারী মাঠ মাঠ মাঠ—পৃথিবীর শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে!

শেখপুরার ষ্টেশনমাষ্টার টেনীদের বাবা। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এদিকে এলেই প্রথম বাড়ি ওদের। ষ্টেশন থেকে আসতে যেতে দু' কি তিন মিনিট লাগে। বড় মেয়ে টেনী বয়স তের। লব কুশ যমজ, এগারোয় পড়েছে। দুজনার চেহারায় এত বেশী সাদৃশ্য যে প্রায় সক্কলেই ভুল করে ফেলে কে লব, কে কুশ! খুদে মেয়ে বেবী আট বছরের। খুদে হলে হবে কি, বিক্রম অনেক! বড়দের সঙ্গে সমান তালে সব করবে,—এরা যেখানে, উনিও সেখানে। ভয় পেলে বলে,—আমি ত' ভয় পাই না। বোধহয় ঐ-কথা বলে বলে নিজেকে সাহস দেয়,—ভূতের কথা মনে পড়লে 'রাম'-নাম করার মত।' ভাই বোনে ভাব খুব। সকল সময়ে দলটি একসঙ্গে থাকে। অবশ্য ঝগড়া যে হয় না তা নয়, তবে মিটে যেতে দেরী লাগে না। টেনী দলের সর্দ্দার কিনা তাই বুদ্ধি ওর টন্‌টনে।

দুই
বাড়ি পালাবার প্ল্যান

সকালে দলটি মুড়ি ও নারকেল নিয়ে পাহাড়ের সব থেকে উঁচু পিঠে গিয়ে বসলো। জরুরী মিটিং। কিউলে মেলা বসেছে, দেখার কি করা যায়! বাবা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, সময় নেই। তাহলে দেখা হবে না? জোড়া মানুষ এসেছে; কাটামুণ্ড কথা কয়; কাঠের ঘোড়ায় চাপলে ছুট্‌তে থাকে, লাফাতে থাকে, সত্যিকারের ঘোড়ার মত—এ সব দেখা হবে না? আর সাতদিন জোর থাকবে, তারপর অন্য কোথায় চলে যাবে! সেই তিন বছর আগে এসেছিল, তখন তারা কত ছোট ছিল! বেবী ত' নাগরদোলায় উঠেই ভ্যাঁ!

বেবী আধচিবানো মুড়ি গিলে বল্লে,—হ্যাঁ কেঁদে ফেলেছিল, বল্লেই হ'ল কিনা, আমি ত' ভয় পাই না—তখন কত ছোট ছিলাম মশাই!—নাক কুঁচকে, চোখ ছোট করে, ভারিক্কী চালে শেষ করে।

টেনী বলে,—আমার একটা প্ল্যান আছে, বলি শোন, কিন্তু কারুকে বলতে পাবে না।

খাওয়া বন্ধ রেখে সব কাছে এগিয়ে আসে।

—কিউল ত' খুব কাছেই, আমরা নিজেরা ট্রেনে করে গিয়ে দেখে আসবো।

—বাবা?

—বল্লা হবে না, ফিরে এসে বললেই চলবে।

—বকুনি খেতে হবে যে?

—মজা করতে গেলে বকুনি খেতে হয়। আমরা ত' সেখানে থাকছি না, একদিনেই ফিরে আসবো।

চুপ করে সব ভাবে। বিষম সমস্যা। মেলা না দেখলে চলে কি করে? এদিকে মা বাবার বকুনি। না না, গিয়ে কাজ নেই। অমনি মনে পড়ে,—জোড়া মানুষ, কাটা মুণ্ড, কাঠের ঘোড়া, আর দেখবার, শোনবার, খেলবার, কত কত জিনিষ! যাওয়াই যাক, বকুনি চুপ্ করে শোনা যাবে।

সেখপুরা থেকে কিউল মাত্র ষোল মাইল। কিউল ই-আই-আরের বড় ষ্টেশন, জংসন। ভোরের ট্রেনে যাওয়া ঠিক হ'ল। সমস্ত দিন দেখে শুনে, আমোদ-আহ্লাদ করে বিকালের গাড়িতে ফিরে আসা যাবে। আরেকটি সুবিধা যে, মা তখন ঘুমাবেন আর বাবা এই শীতের দিন মুড়ি-সুড়ি দিয়ে ষ্টেশন ঘরে ব্যস্ত থাকবেন। চুপ্‌চাপ্ গাড়ীতে উঠে পড়লেই বাস্!

টিকিট? বাবার কাছে টিকিট নেবে কি করে?—বেবী বলে। একটু ভেবে টেনী উত্তর দেয়,—টিকিটের দরকার নেই। কিউলে যখন টিকিট চাইবে, বাবার নাম বললেই সকলে ছেড়ে দেবে—বাবাকে ওরা সকলে চেনে।

কথাটি লবকুশের বিশেষ মনে লাগে না, শেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে। কিন্তু উপায় কি! বাবার কাছে টিকিট কিনতে যাওয়া আর মেলা দেখবার আশা একেবারে ছেড়ে দেওয়া সমান কথা—তার চেয়ে যা হয় পরে হবে। নিমরাজী ভাবে সম্মতি দেয়।

সব ঠিক হয়ে গেল। বুধবার মুসলমান পরবের ছুটি স্কুলে, ঐ দিনই। ছুটির দিন মেলা নিশ্চয়ই খুব জমবে। খাওয়া শেষ হ'ল এতক্ষণে। টেনী বলে,—চল পাহাড়ের উপর দিয়ে দিয়ে দীঘির দিকে যাই। সকলে উঠে পড়ে।

পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে সারিবন্দী চলতে থাকে। কুশ পাথরের টুক্‌রো তুলে ছুড়ে দেয় খুব জোরে। কোথায় গিয়ে পড়ে দেখা যায় না, শুধু ঠক্ করে শব্দ হয়। টেনী হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়!

বেবী বলে,—পায়ে লাগলো বুঝি দিদি ?

টেনী ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে,—বিশুয়া!

আর কিছু বলতে হ'ল না। সকলে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটি কি। সত্যি ত' এতক্ষণ এত আলোচনার মধ্যে বিশুয়ার কথা একেবারে মনে পড়েনি! তাইতো বিশুয়াকে নিয়ে কি করা যায় ? ওর চোখ এড়িয়ে পালায় কার সাধ্যি! শেষে বিশুয়া সব পণ্ড করে দেবে ? শেখপুরায় বিশুয়াকে চেনে না এমন লোক একটিও নেই। ষ্টেশনে গেলে সবপ্রথমে দেখা যাবে বিশুয়াকে। রোগা পাত্‌লা কালো রংএ মানুষ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথায় উস্‌খো-খুস্‌কো কাঁচা পাকা চুল। সামনের দুটো দাঁত নেই, বাকীগুলি পানের ছোপে লাল। গায়ে তালি মারা খয়ের রংএর মোটা সার্ট, গলায় লাল কম্ফার্টার জড়ানো চব্বিশ ঘণ্টা। কম্ফার্টারের একটি অংশ বাঁ' হাত ঢেকে ঝুলে থাকে। চলবার সময়, কাজ করবার সময় কম্ফার্টার এদিক ওদিক সরে গেলে দেখা যায় বাঁ' হাত ওর নেই, শুধু বোতাম

দেওয়া জামার আস্তিন ঝুলছে। অনেকদিন আগে রেলে কাটা পড়ে বেচারীর এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এক হাতেই ও দশ হাতের কাজ করতে পটু।

ট্রেন আসছে। বিশুয়া এক হাতে সিগন্যাল ধরে ঠেলতে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত শরীরের ভার দিয়ে শুয়ে পড়ে সিগন্যাল নামায়।

এরপর ঘণ্টা বাজিয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাট্‌ফরমের ধারে এসে দাঁড়ায়। কে নামলো, কে উঠলো, কোথায় কি চুরি, ঝগড়া বা গণ্ডগোল হ'ল, বিশুয়ার চোখ সবদিকেই আছে। ওই যেন স্টেশনের আসল কর্ত্তা। সব সময়েই কিছু-না-কিছু করছে আর নয় ত' চুপ্ করে প্ল্যাট্‌ফরমের বেঞ্চির উপর চোখ মিট্‌মিট্ করে শুয়ে আছে।

এই বিশুয়ার চোখে ধূলো দিয়ে ট্রেনে চটাপট্ উঠে পড়া বেশ শক্ত কাজ। লবকুশ আস্ফালন করে বলে,—হ্যাঁ ধরবে ধরুক না, গাড়ি ঠিক ছাড়ে-ছাড়ে এম্‌নি সময় এক-এক লাফে ভিতরে গিয়ে উঠবো।

টেনী বললো,—সে ত' হয় জানি, কিন্তু বেবী? বেবী অত জোরে দৌড়াতে পারবে না, লাফাতেও না। বেবী কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে,—আমি ভয় পাই না, পারবো, খুব পারবো—দেখো তখন।

টেনী বলে,—না বাবা, শেষে লাফাতে গিয়ে কেউ চাকার তলায় কাটা পড়ে যাবে। বিশুয়ার মত এক হাতে সব কাজ করতে হবে। মরেও যায় কত লোক!

শেষে অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়, লব-কুশ চারিদিকে

ভাল করে দেখে শুনে বেড়াতে বেড়াতে টুপ্ করে উঠে পড়বে। টেনী বেবীর হাত ধরে এক ছুটে কামরার ভিতর।

মীমাংসা হতে যেন একটা দুর্ভাবনা কেটে যায়, কিন্তু মনে খচ্ খচ্ করতে থাকে—বিশুয়া! বিশুয়াকে এড়ানো বড় বিষম কথা। সকলে আবার দীঘির দিকে পা বাড়ালো।

তিন

বিচ্ছু বিশুয়া

বুধবার সকাল হতে চায় না। টেনী কতক্ষণ থেকে জেগে আছে। এই বুঝি সকাল হয়ে যায়, ভেবে আসলে সারারাত ওর ভাল করে ঘুমই হয়নি। লব-কুশের নাক ডাকছিল, বাবার বেরিয়ে যাবার শব্দ পেয়ে টেনী গা' নাড়া দিয়ে ডাকলো। ধড়মড় করে উঠে বসে বলে,—কি ডাকছো কেন?—এমন বোকা! টেনীর রাগে মুখ লাল হয়ে গেল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে তবে বুঝে ঠাণ্ডা হয়। অতি সাবধানে বেনীকে তোলা হ'ল। শেষে ঘুম ভেঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ না করে দেয়।

রাস্তায় এসে যখন নামলো চারিদিকে সবুজ ভোরের ফিকে আলো। একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করে মাথার উপর জ্বল্ছে। পথে দু'একটি লোক, স্পষ্ট মুখ চেনা যায় না। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া কানে কানে বললে,—যেওনা যেওনা, উঃ বড্ড শীত।

কুঁকড়ে, জড়াজড়ি করে প্ল্যাট্‌ফরমের পূব দিকটায় ভয়ে ভয়ে যখন এসে পৌঁছালো, গাড়ি আসার শেষ ঘণ্টা বাজছে। শাকসব্জীর বোঝা নিয়ে কত লোক তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। এক পাশে এক প্রকাণ্ড পালকী হলদে ঘেরাটোপে ঢাকা। গাঁয়ের জমিদার-বৌ মেলা দেখতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। মাঝে মাঝে ঘেরাটোপ দু'হাতে ধরে এক জোড়া চোখ প্যাট্ প্যাট করে দেখে নিচ্ছে চারদিকের লোকজন।

পাল্‌কীর আড়ালে টেনীরা দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো। আ—হাউ করে বিরাট একটি হাই তুললো বেবী, বেচারীর চোখ ঘুমে এখনো জড়িয়ে আছে।

হু-হু করে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। মানুষের উঠাউঠি গোলমালে চারিদিক মুখর হয়ে উঠলো। একটু আগে এত উত্তেজনা কোথায় ছিল ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

পালকীশুদ্ধ জমিদার-বৌকে গাড়ির কামরার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। টেনীরা এই সুযোগে আড়ালে আড়ালে টুপ্‌টাপ্‌ কামরায় উঠে পড়লো। এত সহজে হবে কেউ ভাবেনি। ভগবান্ যেন দয়া করে এদের সুবিধার জন্য পাল্‌কীশুদ্ধ জমিদার-বৌকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টেনীরা এক কোণে জড়সড় হয়ে গায়ে গায়ে চুপ করে বসে পড়লো। অন্য লোকেরা তখন নিজের নিজের মালপত্র গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

সময় আর কাটতে চায় না। আজ যেন বেশীক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, ঘণ্টাও ত' পড়ছে না। বিশুয়া ভুলে গেল নাকি? এই ত' একটু আগে সিগ্‌ন্যালের উপর শুয়ে পড়ে সিগ্‌ন্যাল নামালো। ট্রেন ছাড়লে, আঃ—বাঁচা যায়।

ঘণ্টা পড়লো। ঢং ঢং ঢং—কড়াকং—কড়াকং—কড়াকং। প্ল্যাট্‌ফরম ফাঁকা হয়ে এসেছে। পাল্‌কী ঘেরাটোপ খুলে চারপায়ে দাঁড়িয়ে। একটা কুকুর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে দেখে চলে গেল। উত্তেজনায় টেনীর বুক দুরদুর্ করছে, জানালা দিয়ে বাইরে দেখবারও সাহস নেই। বেবী চুপিচুপি বলে,—এইবার যদি বাবা এসে পড়েন?

এতক্ষণে যে মালগাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল তার ইঞ্জিনে উঠে ষ্টীম্ ছাড়লো—মালগাড়ি এবার ছাড়বে। মালগাড়ি ছাড়বার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। অনেক সময় রাত দুপুরে ছাড়ে, তখন টেনীর বাবা বিশুয়ার উপর ভার দিয়ে ঘরে শুতে চলে যান, কোন হাঙ্গামা নেই—এত সহজ কাজ।

তিরিশখানি গাড়ির সারি নিয়ে গাধাবোট মালগাড়ি ভীষণ আওয়াজ করতে করতে গড়িয়ে চললো। ষ্টেশনে বিশুয়া ছাড়া এত রাত্রে আর কে থাকবে! নিশান নিয়ে দাঁড়িয়ে বিশুয়ার হঠাৎ যেন মনে হ'ল, শেষের যে খড় বোঝাই গাড়িটি তাতে কালোমতন একটা কি, কাটা দরজা দিয়ে দেখা গেল। অন্ধকারে এক জোড়া চোখ যেন জ্বলে উঠলো। কুকুর বেড়াল হবে আর কি, এমন ত কত যায়! শীতের রাতে খড়ের গাদায় কুকড়ে শুয়ে বেশ আরাম করতে করতে চললো, খড় নামাবার সময় লোকেরা দেখতে পেলে লাফ দিয়ে পালাবে। প্রকাণ্ড এক হাই তুলে, এক হাতে গায়ের কম্বলটি ভাল করে মাথা পর্য্যন্ত জড়িয়ে, বিশুয়া শোবার চেষ্টায় আবার বেঞ্চির দিকে এগুলো।

খড়ের গাদার এক পাশ থেকে টেনী ফিস্‌ফিস্ করে বললো,—লব বলছি ওরকম করে ঝুঁকো না, আরেকটু হলেই ত' বিশুয়া দেখতে পেয়ে গিছলো।

—এখন দেখে করবে কি? গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, ধরে কে?

—ধরে কে মানে? বিশুয়া ইচ্ছা করলে পরের ষ্টেশন থেকে ট্রেন পিছু হটিয়ে আনতে পারে—জান?—কুশ বললো।

—হ্যাঁ পারে তোমায় বলেছে। সে শুধু বাবা পারে, বিশুয়া নয়, বুঝলে বুদ্ধিমান্!

—চুপ্ কর। বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতেই ঝগড়া, নয়? টেনী থামিয়ে দেয়—এই যা একি হ'ল?

—কি, কি দিদি?—সকলে সমস্বরে বলে, বেবী পর্য্যন্ত।

—পয়সার থলিটা কোথায় পড়ে গেছে—কি হবে?

পশমে বোনা সবুজ থলিটি টেনীর বড় প্রিয়। যখন যা পয়সা পায় সযত্নে ভিতরে তুলে রেখে দেয়। বারবার গুণে দেখে ঠিক আছে কিনা। চকচকে সিকি দুয়ানি দেখলে নিজের সঙ্গে বদলে নেয়। কেবল মাত্র মেলা দেখার লোভে সেটি সঙ্গে নিয়েছিল। যা তাড়াতাড়ি আসা, রাস্তায় পড়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কিছু। উঃ, কি কষ্টে আসা গেছে! নিতান্ত মেলা দেখার লোভে এত বড় দুঃসাহসের কাজ করা সম্ভব।

সকালের ট্রেনে যেতে না পেরে ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক হ'ল যাত্রী-গাড়িতে যাওয়া অসম্ভব, বিশুয়ার চোখে ধূলো দিয়ে। আবার যদি ধরতে পারে, বাবাকে নিশ্চয় বলে দেবে এবং যাওয়া আর হবে না। লবের কিন্তু বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। বললো মালগাড়িতে যাওয়া যাক, তখন ষ্টেশনে কেউ থাকে না বড় একটা, আর বিশুয়ার বুদ্ধিতে আসবে না যে মালগাড়িতে যাব।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশুয়ার কাছে জানা গেল, রাত বারোটায় এক মালগাড়ি ছাড়বে। তাই তাই-ই সই। যেতে গেলে ভয় পেলে চলবে না। বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়লেন পাশের ঘরে। চারজন তখন এ-ঘরে

উস্‌খুস্‌ করছে। নিঃশব্দে জামা-কাপড় পরে, পা' টিপে টিপে বেরিয়ে আসা—সহজ কাজ নয়। অমন নিশুতি রাতে নিজের নিঃশ্বাসের শব শুনেও চমকে উঠতে হয়। অলুক্ষুণে পেঁচার ডাক আরেকটু হলে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভয় করে না? কি বিশ্রী আওয়াজ, বুকের ধুকধুকুনি বন্ধ করে দেয়! ভয়ে বেহুঁস হয়ে কোন রকমে খড়ের গাদায় আশ্রয় মিললো। বেবী ত' সমস্ত রাস্তা চোখ বুজে এসেছে চাঁদের আলোয় কত ছায়ামূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

কিন্তু পয়সা-কড়ি না হলে হবে কি? এক টাকা সাড়ে বারো আনা ছিল মোট। কোথায় পড়ে গেল? কাল সকালে কেউ না কেউ কুড়িয়ে পাবে, ভারী মজা লাগবে তার।

টেনী বলে,—পয়সা না দিলে জোড়ামানুষ দেখতে দেবে না, কাঠের ঘোড়ায় চড়তে দেবে না।

লব পকেট থেকে একটা দু'য়ানি বার করে বললো,—এই নাও আর কিচ্ছু নেই।

শুধু দু'আনায় কি হবে—এতগুলো মানুষ!

কুশ বলে,—ফিরে যাই চল। দেখতে যদি না পাই তবে গিয়ে কি লাভ? আর এই রাত্তিরবেলা এসে আমরা ভাল করিনি।

বেবী বলে উঠলো—দিদি, আমার হাত ধরে থাকো। আমি ত' ভয় পাই না।

সত্যি কথা বলতে কি, টেনীরও খারাপ লাগছিল! একে পয়সা হারানোর দুঃখ, তাছাড়া এই চলন্ত ট্রেন থেকে চারপাশের ধোঁয়ার মত গাছপালা ক্ষেত-খামার দেখে গা যেন শিউরে শিউরে উঠে—কেমন

একটা থম্‌থমে ভাব ! কিন্তু হটে যাবার মেয়ে নয় টেনী । মনে যাই হোক, মুখে কিছুতেই প্রকাশ করবে না মরে গেলেও । কেউ বকলে দুঃখে ও লজ্জায় প্রায়ই কেঁদে ফেলে ; কিন্তু ভয়ে টেনী কেঁদেছে, একথা শোনেনি কেউ ।

জোর গলায় টেনী বললো,—কিছু ভেবোনা, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে । বাবা কি বলেন মনে নেই ? বুদ্ধি যার আছে বলও তার ;—তার আবার ভয় কি ?

চুপ করে বসে গাড়ির দোলায় দুলতে দুলতে এক এক করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো সেই খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ে । সারাদিনের ভাবনা ও ট্রেনে চড়ার উদ্বেগে সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল । বেবী টেনীর বুকের ভিতরে কুকড়ে ঘুমাতে লাগলো যেন নিতান্ত ছোট্ট শিশু !

পাঁচ
শ্মশানে ভূত

ঘণ্টাখানেক হবে বা তার চেয়ে কিছু বেশী। পাশ ফিরতে গিয়ে লবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'ল—ট্রেন চলছে না; দাঁড়িয়ে গেছে আর অনেক লোকে মিলে ঝাঁঝর বাজাচ্ছে ঝমাঝম্, তাদের চারপাশে ঘিরে!

স্বপ্ন? না—সত্যি? ট্রেন চলছে না, দাঁড়িয়ে আছে নিঃসাড়ে নিশ্চিন্তে! চলবে বলেও মনে হয় না। ঝম্ ঝম্ শব্দ—বোধহয় ঝিঁঝিপোকার ডাক, কানে তালা লাগিয়ে দেয়।

ধড়মড় করে উঠে বসে লব। উঁকি মেরে দেখে—কেউ কোথাও নেই, একটা মানুষও না। চকচক করছে ওটা কি? টিনের চাল—ছোট স্টেশন বোধহয়, একটা তেলের আলো পর্য্যন্ত জ্বালা নেই!

ষ্টেশনের ছোটবাড়ির দেওয়াল—একবার মনে হয় সত্যি; আবার মনে হয়—শুধু চাঁদের আলো এসে পড়েছে ধবধবে সাদা, আর কিছু নয়। একটা শিয়াল ডেকে উঠে—হুক্কা হুয়া, কাঁঠাল কুয়া, কাঁঠাল কুয়া।

চমকে অন্য দিকে ফিরে দেখে—দূরে একটা আগুন জ্বলছে। চিতা? মড়া পোড়াচ্ছে? শ্মশানের এত কাছে ট্রেন এসে দাঁড়ালো কেন? এমন গভীর নিঃস্তব্ধ রাত্রে? ভূতের কারসাজি নয় ত?—ভৌতিক ট্রেন!

শীতের রাতে লবের কপাল ঘামে ভরে গেল। চেঁচিয়ে ডাকতে গেল, পারলো না। ঝাঁকুনি দিয়ে ঠেলতে লাগলো যাকে পেল—সবাইকে।

উঠে বসে সকলের মুখে এক প্রশ্ন—ট্রেন থামলো কেন? এত রাত্রে?

উত্তর দেবে কে? নিজেদেরই ভেবে চিন্তে আন্দাজ করে নিতে হয়—শ্মশানের জ্বলন্ত আগুন চোখে পড়ে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল—প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে যায় আপনি। বেবী মুখ গুজড়ে আবার ধপ্ করে শুয়ে পড়ে। শোনা গেল, কাঁদছে ফুঁপিয়ে, দেখা যায় না কিছু।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল এমনি ভাবে। কতক্ষণ কারো হুঁশ্ নেই, হিসাব নেই কোন। সব সময়েই মনে হয় একটা কিছু ভীষণ বিপদ এই এল বলে। চারিদিকের সমস্ত পৃথিবী একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র করে তাদের শাস্তি দিতে আসছে, এই এল বলে!

দূরে যে আগুন জ্বলছিল, যে মড়াটা আগুনে পুড়ছিল,—মনে হয় এতক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার কঙ্কাল-দেহ নিয়ে ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দের তালে-তালে এগিয়ে আসছে খট্-খটা-খট্! লম্বা শুধু হাড়-সাজানো হাত বাড়িয়েছে, টুপ্ করে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে! হঠাৎ চাঁদকে এক টুকরো কাল মেঘ এসে ঢেকে দিল। অন্ধকার, আরো অন্ধকার, সে আর নয়, আর সহ্য করা অসম্ভব!

এক ধাক্কা মেরে বেবীকে উঠিয়ে, হাত ধরে টেনে, এক লাফ্ মারলো টেন্দী। কত উঁচু, কোথায় গিয়ে পড়বে, সে সব কোন জ্ঞান

ছিল না—সময় কোথায় ? নীচে পড়েই সটাং উঠে দাঁড়িয়ে সোজা দৌড় যেন কুকুরে তাড়া করেছে ! ষ্টেশন বাড়ির দিকে ছুটলো যেটা একটু আগে চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করছিল। লব-কুশ এক সেকেণ্ড থ' হয়ে বসে। তারপর বলে দিতে হ'ল না কি করতে হবে ! প্রাণের ভয়ে টপাটপ্ লাফিয়ে ছুটে ওদের এগিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, ষ্টেশনই ত', মাত্র দু'খানি ঘর। ছোট্ট ষ্টেশন। পাশে টিনের চালের তলায় বস্তা করে কি সব রাখা আছে স্তূপাকার। ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতরে আলো নেই, অন্ধকার। দমাদম্ কিল চড় লাথি মেরেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ নেই ভিতরে। সব বন্ধ করে যে যার ঘরে চলে গেছে, আসবে আবার সেই সকালে। ষ্টেশনের বাইরে একটা সরু পথ গাঢ় অন্ধকারে গিয়ে মিশেছে ! কিচ্ছু দেখা যায় না,—কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর ! শীতের কনকনে হাওয়া হু-হু করে বইছে। এ অবস্থায় করা যায় কি ? ভূতের পেটে যেতে হয়, যাওয়া যাবে। আশ্রয় যখন নেই কোথাও, তখন এছাড়া আর উপায় কি ?

পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বস্তার স্তূপের উপরে সকলে বসে পড়ে, ভাগ্যের উপর নিজেদের সঁপে দিয়ে,—যা হয় হোক এই ভেবে। দূরের আগুন তখনও জ্বলছে। শিয়ালের ডাক—মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ডাকের বুক চিরে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে,—কখন বহু দূরে, কখনও বা অতি নিকটে। অভিভূতের মত সকলে বসে রইলো। সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো।

মুরগীর ডাকে সকলে আশ্বস্ত হয়ে দেখে—পূব আকাশ ফিকে

মেরেছে। একটু আলো হতে কুশ চেঁচিয়ে পড়লো ষ্টেশনের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা—সিরারী! আরে এ যে শেখপুরার পরের ষ্টেশন! মাত্র এইটুকু এসেছে!

—এ রকম করে গেলে কিউল পৌঁছতে তিন চার দিন লেগে যাবে—লব বলে।

টেনী বললো,—না না, কাল রাত্রি বলে বোধহয় বেশীদূর গেল না। আজ সকালে একটু পরেই আমরা পোঁছে যাবো।

কথা শেষ হতে না হতে বেবী বলে উঠলো,—দিদি, ঐ দেখ কারা আসছে রাস্তা দিয়ে।

দেখলো তিনচারজন মানুষ আসছে, তার মধ্যে কালকের সেই নীল পাজামা-পরা লোকটিও।

—এবার ট্রেন ছাড়বে। চল চট্‌পট্ উঠে বসিগে। এখানে লুকাবার অন্য জায়গা নেই; দেখতে পেলে ধরে শেখপুরা পাঠিয়ে দেবে।

টেনীর কথামত সকলে সন্তর্পণে উঠে আড়াল দিয়ে দিয়ে মাল-গাড়ির কামরায় এসে উঠলো। মুস্কিল হ'ল বেবীকে নিয়ে। অত উঁচু যে উঠতে পারবে কেন? কিছুতে পারে না অনেক চেষ্টা করে। শেষে টেনী কোলে করে উঁচু করলো আর লবকুশ দু'হাত ধরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে তুলে নিল।

ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছিল—এই বুঝি দেখতে পেয়ে যায়! কিন্তু ভগবানের দয়ায় রক্ষা পাওয়া গেল, কেউ দেখেনি। আবার সেই পুরাণো খড়ের গাদায় হাত-পা' ছড়িয়ে আরাম করে বসা গেল।

সূর্য্যের লাল আভা ছড়িয়ে গেছে। লব উঁকি মেরে ঝুঁকে দেখছিল চারিদিকে, বললো,—এইবার ট্রেন ছাড়বে, ইঞ্জিনের ধোঁয়া উঠছে।

দেখা গেল সত্যি তাই। একটু বাদে গা' নাড়া দিয়ে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ করে মালগাড়ি মন্থর-গমনে চললো। প্ল্যাট্‌ফরমের উপর সাইন-বোর্ডে লেখা 'সিঙ্গারী' ক্রমশঃ ছোট হতে লাগলো। দূরে দেখা যায় দু'চারটি গরু বাছুর চরছে। খোড়ো ঘরের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলে টেনী বললো,—আর এক ঘণ্টায় পোঁছে যাব।

সকলেই খুশী। কাল রাতের কষ্ট ও ভয়ের কথা মনে হলে হাসি পায়।

বেবী চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করে,—দিদি, জোড়া মানুষ এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে?

টেনী বলে,—তা নিশ্চয়ই উঠেছে, আর আমরাও গিয়ে পোঁছাচ্ছি, কিন্তু পয়সা কোথায়? এত কষ্ট করে গিয়ে শেষে হয়তো দেখতে পাবো না, মুখ শুকিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

বেবীর মুখ সত্যি শুকিয়ে গেল। কাল রাতের ভূতের ভয় এর চেয়ে কম কষ্টকর ছিল। বললো,—সত্যি দেখতে পাবো না দিদি, তাহলে কি হবে?

লব-কুশের কপালেও চিন্তার রেখা ফুটে উঠে।

টেনী বলে,—না না ভেবো না কেউ। যা হয় একটা উপায় হয়ে

যাবে। বাবা কি বলেন মনে নেই,—ইচ্ছা থাকলে উপায় আপনি হয়ে যায়। ওদের বুঝিয়ে বলা যাবে পয়সা হারিয়ে গেছে, বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দেবো ;—কত আর পয়সা !

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘুম পাড়িয়ে দেয়। চুপচাপ্ বসে কেউ বা দেখতে লাগলো চারপাশের গাছপালা মাঠ, আর কেউ মাঝে মাঝে ঝিমাতে লাগলো। মালগাড়ি ধীর গতিতে গড়িয়ে যেতে লাগলো বলতে বলতে—যাচ্ছি কোথা, যাচ্ছি কোথা ! আর পারিনে, আর পারিনে।

ছয়

কোথাকার জল কোথায় গড়ায়

কিউল বড় ষ্টেশন, জংসন। এখান থেকে কত দিকে যাওয়া যায়, গাড়ি বদল করা যায়। দিনরাত সরগরম হয়ে আছে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে, কেউ বা মোটঘাট পুঁটলিপাটলা নিয়ে বসে আছে ট্রেনের আশায়। পানবিড়ি, কচৌড়ি, পুরী গরম প্রভৃতির চীৎকার কানে ঝালাপালা লাগিয়ে দেয়। অনেক সময় কথা শুনতে পাওয়া যায় না এমনি গোলমাল।

ষ্টেশনের পশ্চিমের মাঠে অনেকখানি খোলা জায়গা। সারি সারি তাঁবু পেতে ও নানা রং-বেরংএর সামিয়ানা খাটিয়ে মেলা বসেছে। কত রকম-বেরকমের জিনিষপত্র কেনা-বেচা হয়। মেলা ছাড়া ঐ সব অদ্ভুত জিনিষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। একপাশে নাগর-দোলা, ঘোরাচাকা, গড়ানো সিঁড়ি এইসব, ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় এদিকেই বেশী। অন্য পাশে লাইনের ধারে ঘেরা জায়গার ভিতর পশুপাখী জন্তু জানোয়ার। হাতীর কুলোর মত কাননাড়া ও লম্বা শুঁড় আস্ফালন অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। একটা আবার উট এসেছে তার পিঠে দুটো কুঁজ ; ভারতবর্ষে এমন দেখা যায় না।

সকাল দশটা বোধ হয় হবে। কে জানে ঘড়ি ত' নেই কাছে ! মালগাড়ি কিউলের কাছে এল। টেনী, লব, কুশ বেবী, মুখ বাড়িয়ে

উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখলো মেলার জায়গাটি। বেশ লোকজন জমেছে, নানারকম চীৎকার করে বেচাকেনা হচ্ছে। ঐ একটা লোক মুখে কালিঝুলি মেখে বোধ হয় ম্যাজিক দেখাচ্ছে, হাতের পায়রাটি এবার উড়িয়ে দেবে। বাজনা বাজিয়ে ঐখানে লোক জড় করছে, এটা বোধ হয় জোড়ামানুষের তাঁবু! কি রকম দেখতে কে জানে? সমস্ত শরীরটা জোড়া? দুটো মাথা, চারখানা পা? আর একটু বাদেই দেখে সন্দেহ ভঞ্জন করা যাবে।

লব মনে মনে ঠিক করে নিল কি ভাবে কাকুতি-মিনতি করে বোঝাবে, পয়সার জন্য যদি ঢুকতে না দিতে চায়!

এই স্টেশনে ট্রেন ঢুকলো। একটু লুকিয়ে থাকা যাক কেউ দেখতে না পায়। ট্রেন থামলে কি ভাবে অন্য দিক থেকে নেমে ঐদিকে যাওয়া যাবে, টেনী ফিস্‌ফিস্‌ করে সকলকে বলে দেয়। কিন্তু একি? ট্রেন দাঁড়ায় না কেন? ওমা' এযে স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে! ঐ ত' বিশুয়ার মত একজন সবুজ নিশান নাড়ছে! ট্রেন থামবে না? লব-কুশের চোখে দুঃখে জল এসে গেল। বেবী বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো। টেনীর ইচ্ছা হচ্ছিল ঝাঁপ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে,—মাথা ফেটে যায় যাক! মেলা দেখতে না পাওয়ার চেয়ে সে অনেক ভাল।

মালগাড়ি তেমনি গড়াতে গড়াতে নির্বিবকারভাবে মন্থর গতিতে চলতে থাকলো। কিউল স্টেশনের শেষ সিগন্যাল দেখা যেতে যেতে আকাশে মিলিয়ে গেল।

কুশ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলে,—তোমার জন্যই দিদি

এই সব। বলেছিলাম লবের বুদ্ধি নিয়ে মালগাড়িতে এস না ; কোথায় থামবে, কোথায় থামবে না—এর কিছু ঠিক থাকে না। এখন কি হ'ল ?

সত্যি তাই, মালগাড়ির চলাফেরার কোন ঠিকঠিকানা নেই। কোথাও ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলো সারারাত সারাদিন ; আবার বড় বড় স্টেশন পেরিয়ে গেল এক মিনিটও না থেমে, কোন ভ্রূক্ষেপ না করে।

টেনীরও রাগ কম হয়নি। বল্লে,—আমি কি সব জানতাম আগে থেকে ? সব গাড়িই ত' কিউলে দাঁড়ায়, বিশুয়া বলতো শোননি ? এখন আমার উপর যত দোষ।

বেবী বললো না কিছু। মনে মনে ভাবলো এদের সঙ্গে এসে উচিত কাজ হয়নি। মেলা দেখা হ'ল না, এদিকে ক্ষিদে পাচ্ছে বেশ। মার কাছে থাকলে এতক্ষণে তিন চারবার টুকিটাকি খাওয়া হয়ে যেত।

সকলে গোঁজ হয়ে বসে রইলো কোন কথাবার্ত্তা না বলে। ইচ্ছা হচ্ছিল মালগাড়ির কামরার লোহার দেওয়ালে ঘুঁসি মেরে মেরে ভেঙ্গে ট্রেন থামিয়ে দেয়। এত কষ্ট, এত দুঃখ করে শেষে এই! এ আপশোষ রাখবার জায়গা কোথা ?

রাগ কমলে ক্রমশঃ ভয় ও ভাবনা সুরু হয়। কি হবে ? কোথায় কতদূরে গিয়ে থামবে ? সেখান থেকে ফিরবে কি করে ? যদি সে অনেক দূরে নিয়ে যায় ? নতুন জায়গা, একটি চেনাজানা মানুষও নেই, কেউ হয়তো ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে বন্ধ করে রেখে দেবে। ভাবলে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। এ যে

মালগাড়ি,—ধরে টানবার, গাড়ি থামাবার, সতর্ক-চেনও নেই। প্রাণপণে চীৎকার করলেও শুনতে পাবে না। আর পারিনে, আর আর পারিনে, যাচ্ছি কোথা, যাচ্ছি কোথা,—সেই একই কথা একই সুরে বলতে বলতে মালগাড়ি ছুটে চলেছে। তার একটি কামরায় যে চারটি মানুষ মাথা খুঁড়ে মরছে একটু থামবার জন্য, কিউল্লে মেলার কাছে ফিরে যাবার জন্য,—সে কথা জানবে কে?

স্টেশনের পর স্টেশন উড়ে উড়ে চলে গেল ট্রেন থামলো না। দুঃখে, খিদের কষ্টে চারটি ভাইবোন বসে বসে দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দু'চারবার লাইনের পাশে মানুষ দেখে চীৎকার করে ডাকলো, ট্রেন থামাতে বললো, সেকথা কেউ শুনলো না।

লব কুশ বেবী, অবসাদে ক্লান্তিতে বসে থাকতে পারলো না; খড়ের গাদায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। টেনী অনেকক্ষণ চুপ্ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলো। মনে মনে নিজেকে দোষ দিতে লাগলো কাজটি ভাল হয়নি। এভাবে বাড়ি থেকে চলে আসা, এদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। সত্যি দোষ তারই বেশী। এখন উপায় কি হবে? কোথায় কি ভাবে গিয়ে ট্রেন থামবে সমস্তটাই অজানা! দুঃখে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এক ভাবে চেয়ে চেয়ে চোখদুটো জ্বালা করতে লাগলো। চোখ বুজে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লো জানতে পারলো না।

সাত
ছেলেধরা সার্কাস

একটানা দৌড়ে এসে ট্রেন যখন থামলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। টেনী দেখলো লেখা আছে—মধুপুর।

এই সেই মধুপুর, কলকাতায় মামার বাড়ি যাবার সময় এই স্টেশন ছুঁয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। বাবার কাছে অনেকবার শুনেছে। ওঃ শেখপুরা থেকে কতদূরে এসে পড়েছে! যে জায়গাই হোক, পৃথিবীর যত দুর্গম স্থানই হোক, না নামলে আর প্রাণ বাঁচে না। খিদে তেষ্টায় সব আধমরা হয়ে গেছে। বেবী চোখ বুজেই পড়ে আছে, মুখ শুকনো, আপেলের মত তোবড়ানো—চুল উস্‌কো খুস্‌কো। আহা বেচারী, কত ছোট, কষ্ট হয় না!

জাহান্নামে যাক্ এই মালগাড়ি, আর যদি জীবনে কোন দিন এর ত্রিসীমানায় আসে! প্ল্যাট্‌ফরমের অন্য দিকে নেমে পড়ে তারের বেড়া টপ্‌কে স্টেশনের বাইরে এসে তারা দাঁড়ালো, সেই প্রকাণ্ড কুল গাছটার নীচে—যার মাথায় হাজার হাজার পাখী একসঙ্গে কিচিরমিচির করে গান গাইছে। দেখলো—একটু দূরে একটা খাবারের দোকান; দেখেই যেন শরীরে শক্তি ফিরে আসে!

কাছে গিয়ে লব বলে,—গরম জিলিপি খাওয়া যাক দিদি।

—কি করে হবে ভাই, পয়সা যে বড় কম! জিলিপি খেলে পেট ভরবে না, খিদেয় সকলে মরে যাচ্ছি।

শেষ পর্য্যন্ত হিসাব করে দু'আনার মুড়ি ও পাটালী কেনা হ'ল। দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে খেয়ে জল খেয়ে মুখের হাসি আবার ফিরে এল। দোকানী দু'চারটি প্রশ্ন করে এদের ব্যাপার জানবার চেষ্টা করে; কিন্তু টেনীর চোখের ইসারায় স্পষ্ট জবাব দিল না কেউ। বাইরে বেরুলে হুঁসিয়ার না হয়ে উপায় নেই!

টেনী বলে,—চল একটু ঘুরে দেখা যাক ও ভাবা যাক কি করা যাবে।

লব বললো,—এখানে যদি একটা মেলাটেলা হয় ত' ভারী মজা! দেখে শুনে বাড়ি ফেরা যাবে।

ষ্টেশনের সামনে থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে। সেই পথে তারা চললো। রাস্তার দু'ধারে সুন্দর সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ি, খেলবার পার্ক। চারিদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠছে। কোথা থেকে শাঁখ বেজে উঠলো, তিনবার। বেবী টেনীর হাত ধরে চলছিল, বললো,—মাও এখন শাঁখ বাজিয়ে তুলসী-তলায় আলো দিচ্ছে, না দিদি?

টেনী ছোট্ট একটি 'হুঁ' দিয়ে পথ চলতে লাগলো।

কিছুদূরে এসে সামনে আঙ্গুল দেখিয়ে কুশ হঠাৎ চীৎকার করে উঠে,—দেখ দেখ ওটা কি!

সকলে দেখে এক প্রকাণ্ড মাঠে একটি বেশ বড় সাদা তাঁবু ফেলা। গেটের সামনে মঞ্চের উপর ব্যাণ্ড বাজছে আর লোকজন আসা-যাওয়া করছে। চারিদিকে আলোয় আলো।

একটি ছেলে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে না কোথায় যাচ্ছিল। টেনী

চেনা না থাকলেও তাকে জিজ্ঞাসা করে বসে,—ঐখানে কি হচ্ছে ভাই ?

সে পরম বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে উত্তর দেয়,—তোমরা জান না ? এখানে থাকো না বুঝি ? থানার মাঠে সার্কাস এসেছে।

সার্কাস ! সার্কাস দেখবো—লব কুশ বেবী লাফিয়ে উঠে।

এতক্ষণে মনে হয় কিউলের মেলায় ট্রেন না থেমে ভালই হয়েছে। সার্কাস ত' দেখা যাবে।

লব খুব উৎসাহে জিজ্ঞাসা করলো ছেলেটিকে,—বাঘ সিংহের খেলা হয় ?

—হয়। পরশু আমি দেখে এসেছি। সিংহের মুখের ভিতর একটি মেয়ে মাথা ঢুকিয়ে দেয় ; হাতীর উপর বাঘ, তার পিঠে ছাগল—খেয়ে ফেলে না। জানো আমরা যেদিন গিছলাম, একটা বড় বাঘ আগুনের ভিতর দিয়ে ঝাঁপ্ খেতে গিয়ে খেপে গেল। আরেকটু হলে বাইরে বেরিয়ে আসতো, ইলেকট্রিকের চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করলো। আবার একদিন যাবো।—ছেলেটি এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

টেনীর হাত ধরে টানাটানি চলে ; চল, চল না দিদি, এক্ষুণি !

টেনী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে,—টিকিট কত করে ?

—চার আনা থেকে পাঁচ টাকা সবরকম আছে। আচ্ছা তোমরা দুজন একরকম দেখতে কেন ? যমজ ভাই বুঝি ? কি মজা হবে তোমরা যদি সার্কাস কর।—দুষ্টামীর হাসি হেসে শেষ করে।

লব কুশ একসঙ্গে বলে উঠল,—ধেৎ ! আমরা যে স্কুলে পড়ি।

ছেলেটি চলে গেল। এরাও সার্কাসের তাঁবুর দিকে রওনা হ'ল। যেমন করেই হোক দেখতে হবে আজ।

সার্কাসের সামনে বেশ ভিড। লোকজন দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে। কেউ বা আসা-যাওয়া করছে। আরম্ভ হতে দেরী আছে। লাল পাজামা ও গলাবন্ধ কোট পরে পাঁচজন লোক ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে মঞ্চের উপর। দু'গাল ফুলিয়ে মুখ লাল করে মাথা নেড়ে নেড়ে বাঁশী যে বাজাচ্ছে তার উৎসাহটাই বেশী। কত লোক টিকিট কিনে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢুকছে, আগে থেকে ভাল জায়গায় বসবার আশায়।

এরা উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো। কি করে ঢোকা যায়? লব পরামর্শ দেয়—পিছন থেকে কোন ফাঁকে ভিতরে যাওয়া যাক। কুশের মনঃপূত হয় না, শেষে ঘাড় ধরে বার করে দেবার সম্ভাবনা আছে, লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। তার চেয়ে সোজাসুজি বলাই ভাল।

লব টিট্‌কারি কেটে প্রশ্ন করে,—বলবে কে? বললেই যদি ঘাড়টি বাগিয়ে ধরে, তখন?

কুশ রেগে উত্তর দেয়, হ্যাঁ সে বলতে রাজি আছে যা হয় হোক গে।

বেবী হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে—সেই ভাল; এক্ষুণি বলে ঢুকে পড়া যাক।

কিন্তু কাকে বলতে হবে? লালশালু মোড়া প্রবেশ-পথ তৈরী হয়েছে। পাশে চেয়ার নিয়ে দু'জন মানুষ টিকিট দেখে নিচ্ছে।

আরেকজন দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যে দাঁড়িয়ে, তার সাজ-পোষাক দেখে মনে হয় সে ঘোড়ার খেলা দেখায়। কালো ব্রিচেস পরা কিনা, আর সেই লম্বা টেল্ কোট, সেই যে মোটা ল্যাজের মত পিছনে ঝুলে থাকে। ওকে বললেই হবে। ঘোড়ার খেলা যে দেখায়, সে ত' বড় কেউ-কেটা নয়, তার কথার দাম নিশ্চয় আছে।

গুটি গুটি কুশ এগুতে লাগে, টেনীও দল ছেড়ে পিছন নেয়।

ঠিক এই সময় আরেকজন মোটাসোটা মানুষ ভিতর থেকে এসে এদের কাছে দাঁড়াতেই, সকলে উঠে দাঁড়ালো—কি কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো। এই লোকটিকে সত্যি দেখবার মত—বিশেষ করে তার মস্ত গোঁফজোড়া।

বেশ মোটা লোক, ঘাড়ে গর্দ্দানে। ব্রিচেস্ পরাতে জালার মত পেটটি আরো ফুলে উঠেছে। কালো কুচ্‌কুচে রং বার্ণিশ করা, দাঁত-গুলি সেই তুলনায় তেমনি সাদা ঝক্‌ঝকে বড় বড়। আজব বটে গোঁফজোড়া। মোটা দড়ির মত ঘন গোঁফ দুপাশে বেঁকে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দাড়ি-কামানো মুখের উপর যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে! কোটের উপর বুকের দুপাশে অনেকগুলি সোনা ও রূপার মেডেল, দূর থেকে ঝল্‌মল্ করছে।

কুশ ও টেনী কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। হাসি পাচ্ছিল লোকটিকে দেখে। সবচেয়ে মজা লাগছিল ওর গলার আওয়াজ শুনে। ঐ প্রকাণ্ড দৈত্যের মত মানুষ ত', কিন্তু গলার আওয়াজ একেবারে সরু পিনপিনে। হাসি পায় না? কুশ হেসে ফেললো শেষ পর্য্যন্ত!

লোকটি জিজ্ঞাসা করলো,—কি চাও তোমরা?

কুশ হাসি থামাতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে গেল, উত্তর দিতে পারলো না।

টেনী বললো,—সার্কাস দেখতে চাই।

—তা যাও, টিকিট কিনে আন।

—পয়সা নেই, এমনি দেখতে দিন।

লোকটি ও অন্য যারা ছিল বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। দেখে মনে হয় না এরা গরীব বা ভিখারী ; অথচ সার্কাস দেখতে এসেছে পয়সা না নিয়ে।

হামাগুড়ি গোঁফওয়ালা মানুষটি আবার জিজ্ঞাসা করে,—পয়সা আন নি কেন ?

—বাড়ি থেকে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে—এবার কুশ উত্তর দেয়।

—যাও নিয়ে এসগে।

—অনেক দূরে বাড়ি, গেলে আর ফিরে আসতে পারবো না।

এসব কি বলে রে বাবা ! গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না !

ধমক দিয়ে বললো,—বাড়ি কোথায় ?

টেনীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কুশ চট্‌পট্ উত্তর দেয়,—শেখপুরা।

—শেখপুরা ! অতদূর থেকে এসেছ সার্কাস দেখতে ? কার সঙ্গে এসেছ ?

এতক্ষণে লুব ও বেবী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

—একলা এসেছি আমরা ক'জন।

লব যোগ দিয়ে বলে,—আমরা কিউলে মেলা দেখতে বেরিয়েছিলাম কিন্তু ট্রেন থামলো না সেখানে, সোজা এখানে এসে থেমেছে; তাই দেখতে এলাম সার্কাস। আপনাদের অনেক জন্তুর খেলা আছে না? আমরা শুনলাম এই মাত্তর।

অবাক কাণ্ড! ওরা সব বলে কি? ভূ-ভারতে এমন কেউ শুনেছে? শেখপুরা থেকে ট্রেনে উঠলো কিউলে মেলা দেখতে যাবে আর সোজা এসে ট্রেন থামলো মধুপুরে, থানার মাঠে সার্কাসের তাঁবুর সামনে! এ যেন সেই—

'এখান থেকে মারলাম তীর লাগলো কলাগাছে, উরুত বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা!'

অন্য সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। চারপাশে মানুষ জমে গেল। এ আরেকটি নতুন মজার খেলা। কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগলো,

—দেখেছ ছেলেদু'টি কেমন একরকম দেখতে! ওদের সার্কাসে নামালে 'ফাইন পেয়ার' হবে।

মোটা লোকটি হাসেনি, চারদিকে দেখছিল। ও কপাল কুঁচকে কি ভেবে নিল।

হাত নেড়ে সকলকে সরিয়ে বললো,—এস আমার সঙ্গে, সার্কাস দেখতে দেবো।

কুশ আড়চোখে লবের দিকে তাকিয়ে টেনীকে বলে,—দেখলে দিদি, কার কথা ঠিক হ'ল? বললাম ভাল করে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় দেখতে দেবে। আর লবটা বলছিল কিনা পিছন থেকে—যত চুরি রিজে ওর।

লব একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, টেনী থামিয়ে মোটা লোকটিকে বললো,—আমাদের যেখানে হোক বসতে দেবেন, ভাল জায়গা চাইনা।

লোকটি ঘাড় নেড়ে বড় তাঁবুর ভিতর দিয়ে অন্য একটি ছোট তাঁবুতে নিয়ে গেল। ছোট তাঁবুতে একপাশে একটি ক্যাম্প খাটে বিছানা পাতা, অন্য দিকে চেয়ার টেবিল সাজানো। এদের বসিয়ে বারবার ভাল করে জিজ্ঞাসা করে নিল নামধাম, বাড়ি, বাবা কি করেন ইত্যাদি। এরা খুসী মনে স্পষ্ট উত্তর দিল। ভয়ের কি আছে? এমন ভাল মানুষ এক কথাতেই সার্কাস দেখতে দিতে রাজি হয়ে গেল, একে মিছে কথা বলবার দরকার কি?

সব শুনে লোকটি বললো,—তোমরা এখানে বসে থাকো, আমি যাচ্ছি, সার্কাস আরম্ভ হলে ডেকে পাঠাবো।

লোকটি এদের বসিয়ে রেখে চলে গেল।

আট
সার্কাসের খেলা

সার্কাস আরম্ভ হ'ল। একেবারে ধারে একটি খালি বক্সে এদের বসতে দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু জলখাবারও খাওয়া হয়ে গেছে। পরম আরামে ঠেসান দিয়ে বসে প্রোগ্রাম পড়ে টৈনী বুঝিয়ে দিতে লাগলো কার পর কি খেলা হবে। বেবী ত' আনন্দে বেহুঁশ! বেচারী আগে কোনদিন সার্কাস দেখেনি। লব কুশ মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে খেলার দোষগুণ বিচার করে। টৈনী নির্ব্বাক নিশ্চিন্ত ভাবে বসে। মনের খুশী চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছে, অনেক কষ্ট করা সার্থক হ'ল। সত্যি সার্কাসটি উঁচুদরের। এত সুন্দর সুন্দর খেলার কায়দা খুব কমই দেখা যায়। সব রকমের মানুষ ও নানা রকমের জন্তু-জানোয়ার নিয়ে দলটি যে সম্পূর্ণ অভিনব, একথা অস্বীকার করা যায় না।

রোগা হলদে রংএর চীনেম্যান্, চ্যাং দেখালো নানা অবস্থায় হাড়গোড় ভাঙ্গা শোয়াবসা, নাকের উপর বলের ব্যালান্স, আর পাঁচটি ভীষণ বিপদজনক খোলা ছুরি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে নানা ভাবে লুফে নেওয়া। সব সময়ে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি চকচকে ছুরির ফলা শরীরে বিঁধে যায়। কিন্তু যায়নি একবারও।

প্যারালাল-বার ও রিংএর খেলা দেখালো সুজিৎকুমার ও টিপু। টিপু মানুষ নয়, গরিলা! প্রথমে এসে যখন ঢকলো, মনে হ'ল দু'টি

গরিলা আসছে, একটি কালো—একটি ফর্সা। সুজিৎকুমারের দেহ যেন পাথরের তৈরী। বেঁটে গাট্টা-গোট্টা মানুষ, চোয়াল উঁচু, বিশাল বুকের ছাতি—অবিকল গরিলার মত দেখতে। আর টিপু? গরিল্লার চেহারা—কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষের বুদ্ধি। কেউ যেন ওকে শেখায়নি—সব আপনি করে যাচ্ছে! এমন চমৎকার খেলা স্বপ্নেও দেখা যায় না।

ঘোড়া, হাতী ও উটের নানারকম খেলা দেখালো সেই কালো ব্রিচেস্ ও টেল্ কোট পরা লম্বা লোকটি, মস্ত এক চাবুক নিয়ে। চাবুকের পটাপট্ শব্দে ঘোড়া, হাতী, উটের কতরকম দৌড় ঝাঁপ, পা তুলে দাঁড়ানো, ব্যাণ্ডের তালে তালে নাচ।

এরপর এক লম্বা তার খাটানো হ'ল আর তাবুর সেই উঁচু ছাদের নীচে একটি দোলনা। দেখলেই বোঝা যায় কি হবে। বেবী নড়ে চড়ে তৈরী হয়ে বসলো, আর ওর চোখের পাতা পড়বে না।

লব বলে,—ঐ উপর থেকে যদি পড়ে একবার ত' ছাতু। কুশ, পারবে তুমি?

—নীচে জাল থাকবে মশাই, জান না কিচ্ছু, পড়লেই টুপ্ করে ধরে নেবে। না দিদি?

—হ্যা।

—নিজে পার কি, বল না? লব এক গোঁজা মেরে ফিরে প্রশ্ন করে। উত্তরে কুশ এক থাপ্পড় তুলেছিল। টেনী থামিয়ে বলে উঠে,—দেখ দেখ কে আসছে, কি সুন্দর!

একটি পরীর মত মেয়ে জাপানী ছাতা কাঁধে নাচতে নাচতে

এগিয়ে এল। বাদামী রংএর গেঞ্জীর আঁটসাট পোষাক, ব্লু জাঙ্গিয়া, মাথায় লাল টুকটুকে প্রজাপতি 'বো'। খোলা ছাতার উপর কত রংএর পাহাড়-পর্ব্বত নদী গাছপালা আঁকা। সামনে এসে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে টুক্ করে উঠে পড়ে তারের উপর। ব্যাণ্ডের সুর বদলে মিষ্টি নাচের বাজনা বাজতে লাগলো মৃদু আওয়াজে। মেয়েটির ভয়-ডর কিচ্ছু নেই। পা যেন সব সময়ে, যে কোন অবস্থায়, চুম্বকের মত তারে আটকে আছে। পড়েও পড়ে যায় না। মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ করে আবার হাসছিল। পরে উঠলো সেই তাঁবুর ছাদের ঝোলা দোলনাতে।

বেবী বিড় বিড় করে বলছে,—আমি ত' ভয় পাই না, আমি ত' ভয় পাই না।

টেনী বুঝতে পারলো বেবী ভয় পাচ্ছে। বেবীর হাত নিজের হাতের মুঠায় চাপ দিয়ে ধরে রইলো। খেলার শেষে যখন মেয়েটি ঝাঁপ দিয়ে নীচের জালে এসে পড়লো, বেবী তখন চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে।

টেনী বললো,—কি সুন্দর, না ?

লব কুশ জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

বেবী বলে,—এর নাম কি বল্লে গা দিদি।

সত্যি ত' বেহুঁশ হয়ে দেখতে দেখতে নাম জানার কথা মনে পড়েনি। প্রোগ্রাম দেখে টেনী বলে,—এলিজা—নামটি ভাল নয়, করে কিন্তু বেশ। বেবী মন্তব্য করে।

—তোমার নিজের নাম কি, বড্ড ভাল বুঝি ?

পয়েস্থ-নসি-মসি। লব খুন্‌সুটি করে বলে।

—দেখলে দিদি, আবার ঐ বলছে এখানে সকলের সামনে! কাঁদ কাঁদ আবদারের সুরে বেবী আবেদন জানায়।

বেবীর ভাল নাম পূর্ণিমা। বেচারী যখন একটু আধটু বানান করে পড়তে শিখেছে, একদিন বাবা পূর্ণিমা বানান করতে বলেন। অম্লানবদনে বেবী বলে যায় পয়স্থ-নয়সি-ময়সি। আর যায় কোথা! এরপর থেকে ভাই বোনেরা সুযোগ পেলেই ক্ষেপায় পয়েস্থ-নসি-মসি!

আরো অন্য সব খেলা চলতে থাকে। মাঝে মাঝে এসে হাসিয়ে যায় ক্লাউন দু'টি, আম্বো ও জাম্বো। আহাহা, সাজসজ্জার কি ছিরি-ছাঁদ! ভূতের মতন সেজেছে! সাততালি দেওয়া রামধনু রংএর ঝল্‌মলে পোষাক, দু'পায়ে দু'রকম জুতো, মাথায় চোঙ্গ হনুমান টুপী! জাম্বোর নাক পাঁচ ইঞ্চি লম্বা লাল টক্‌টকে, যেন বোলতা কামড়েছে! আম্বোর নাক বেগুনে থ্যাবড়া, জাপানীদের হার মানায়! চলছে ফিরছে আওয়াজ করে, চটাপট্‌ থাপ্পড় এ মারে ওকে, ও মারে একে!

এ দুটি সর্ব্বঘটে আছেন অঘটন ঘটাতে, আর যতরাজ্যের কুপাট করতে। চ্যাং একমনে নাকের উপর বল-ব্যালান্স্‌ করছে, পিছন থেকে গিয়ে কিনা কানে বিড়াল-ডাক ডাকলো, বিকট ম্যাঁও করে! চ্যাং চমকেই সামলে নিল। এলিজা নড়বড়ে হালকা তারের উপর মাত্র ডানপায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর করে ছাতা দোলাচ্ছে, আম্বো জাম্বো তারের খুঁটি ধরে নেড়ে দিল। ছেলেমানুষী ত' নয়, যদি পড়ে যেত?

একবার কিন্তু ভারী জব্দ হয়ে গেল। বেশ হয়েছে, এই ত'

উচিত্ সাজা। তামাসা করতে গিছলো টিপুর সঙ্গে, শিক্ষা পেয়ে গেল। গরিলার সঙ্গে চালাকি, সোজা ব্যাপার নয়!

সুজিৎকুমার ও টিপু বারের খেলা দেখাচ্ছে। টিপুর সামনে গিয়ে খোঁকা দিতে লাগলো,—এই পড়ে যা, পড়ে যা—এমনি করে। বিরক্ত হয়ে টিপু হঠাৎ এক ছোঁ মেরে দু'জনার চোঙ্গ-টুপিশুদ্ধ মাথার চুল ধরে হিড় হিড় টান। আম্বো জাম্বো ঝুলতে লাগলো শূন্যে, আর পরিত্রাণে চীৎকার,—মরে গেলাম ছেড়ে দে রে বাবা! সমস্ত লোকে হেসেছে হো হো হাউমাউ করে, পেটে ব্যথা ধরে গেল। বেশ হয়েছে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল্!

ইন্টারভ্যালের সময় আম্বো জাম্বোর কাণ্ড কারখানা আলোচনা করে টেনী বেবীরা হেসে খুন। চেয়ার থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে, এমন বেদম হাসি! সেই হামাগুড়ি-দেওয়া গোঁফ, কালো লোকটি এসে বললো,—কি খোকাখুকীরা কেমন লাগছে?

কৃতজ্ঞতায় গদ্গদ হয়ে সকলে জানালো, চমৎকার, খুব ভাল! জীবনে এমন দেখেনি কখনো।

—বাঘ সিংহের খেলা কখন হবে?

—ও শেষের দিকে, বেশ মজা।

লবের এখন খুব সাহস; জিজ্ঞাসা করে,—আপনি কি করবেন?

—দেখবে সময় মত। তোমরা পার এসব করতে?

—নিশ্চয়ই। খুব পারবো। আমরা ত' স্কুলে জিম্ন্যাস্টিক্ শিখি কালীবাবুর কাছে। শেখালে নিশ্চয় পারবো।—লব কুশ মিলে মিশে বলে।

টেনার দিকে ফিরে লোকটি বলে,—আর তুমি ?

টেনী উত্তর দেয় না, চোখ নীচু করে মিটি মিটি হাসে।

জিজ্ঞাসা না করতেই বেবী হঠাৎ বলে উঠে,—আমি ভয় পাই না কিছুতেই।—সকলে হো হো করে হেসে উঠলো।

শেষের খেলা দু'টি সত্যি চমৎকার। রোমাঞ্চকর যাকে বলে, ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

মাঝখানে একটি পরিখা তৈরী করে আগুন জ্বালানো হ'ল। দু'দিকে খুব সরু লম্বা লম্বা তক্তা পাতা উঁচুতে। মোটার-সাইকেলে তীরের গতিতে এসে লাফিয়ে পার হয়ে গেল সেই মোটা লোকটি, একবার, বার বার তিনবার। প্রোগ্রামে নাম দেখলো লেখা আছে চন্দ্ররাও। ও এই চন্দ্ররাও সার্কাসের মালিক ? ঠিক লাফাবার সময় চোখের সামনে উত্তেজনায় ও আতঙ্কে একটা ঝাপ্‌সা মতন কি হয়ে যায় ! শেষ হলে দেখা যায় বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে, কপালে ফুটে উঠেছে ঘামের বিন্দু। প্রথমবারে বেবী চীৎকার করে উঠেছিল, টেনী তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়ে থামায়।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন ভদ্রলোক এসে একটি মেডেল পরিয়ে দিয়ে গেলেন। আগুনের উপর দিয়ে এত লম্বা ঝাঁপ এর মত কেউ পৃথিবীতে লাফাতে পারে না। সেইজন্য এর এত খাতির ও নাম-ডাক। নিজের জীবন বিপন্ন করে রোজ এই খেলা দেখাতে হয় অন্য মানুষদের আনন্দ দেবার জন্য। যদি একদিন লাফাতে গিয়ে পড়ে যায় !

সবচেয়ে শেষ খেলা বাঘ ও সিংহ নিয়ে। চারিদিকে ঘেরা লোহার খাঁচা তৈরী হয়ে গেল, ঠিক মাঝখানে পাঁচমিনিটে। যেন ম্যাজিক্! বেবীর ঘুম পাচ্ছিল, মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে সোজা হয়ে বসলো। প্রথমে এল এয়া-বড় এক কালো হলদে ডোরাকাটা বাঘ—রয়েল বেঙ্গল—চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড এক হুঙ্কার! পরে আরেকটি, একটু ছোট আকারের। বোধহয় এর জুড়ি। এবারে একটি কেশর-ফোলানো সিংহ, মাথাটা এত বড় যে একজন মানুষ দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে পারে না। সিংহ এসে এক কোণে ওৎ পেতে ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে লাগলো। ভাবটি এই যে, বেশী গোলমাল করেছ ত' বাস্, একটি থাবায় লোপ পাইয়ে দেব।

একজন মেয়ে আঁটসাট কালো গরম পোষাক পরে, একটি চাবুক ও একটি লম্বা চকচকে পিতলের লাঠির মতন নিয়ে সিংহের সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকলো। বাঘ সিংহের হাঁক-ডাক পিতলের লাঠি চোখের সামনে আনতে থেমে যাচ্ছিল।

লব বললো,—ঐ হচ্ছে ইলেক্ট্রিক্ চাবুক, গায়ে ছোঁয়ালেই জ্বলে যাবে। দেখছো না কেমন ভয় পাচ্ছে?

বেবী বলে,—যদি বাঘ-সিংহরা বেরিয়ে পড়ে কোন রকমে,—সেই যে রাস্তার ছেলেটি বলছিল, তাহ'লে?

সকলেরই একটু একটু ভয় হচ্ছিল বৈ কি! তবু বেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে টেনী বললো,—না না লোহার খাঁচার ভিতর দিয়ে আসবে কি করে? আবার ইলেক্ট্রিক্ চাবুক আছে হাতে।

কুশ বলে,—বইতে পড়নি একজন আবার পিস্তল নিয়ে বাইরে

তৈরী হয়ে থাকে, সে রকম কিছু গোলমাল হলেই দুম্ করে গুলি করে মেরে ফেলে।

প্রোগ্রাম দেখে টেনী বললো,—যে খেলা দেখাচ্ছে ঐ মেয়েটির নাম রমাবাই। সাহস আছে বলতে হবে।

সবশেষে খাঁচায় ঢুকলো প্রকাণ্ড এক রামছাগল, পাকানো শিং, লম্বা সাদা দাড়ি। বাঘ, সিংহ, ছাগল, এক সঙ্গে বসে টেবিলের উপর পা' তুলে খেলে। এ ওর পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। ছাগলের পিঠে একটি আগুনের রিং রাখা হল, তার ভিতর দিয়ে দু'টি বাঘ ও সিংহ বার বার লাফিয়ে পার হয়ে গেল।

আগুনের ভিতর দিয়ে লাফাবার সময় বড় বাঘটি ভীষণ গোলমাল সুরু করলো। কিছুতেই রাজি হয় না লাফাতে। দু'বার চাবুক মারতে হ'ল, তবুও না। মেয়েটি চাবুক আবার যেই তুলেছে, ঘাঁক্ করে এক লাফে প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল আর কি! দর্শকদের মধ্যে কত লোক ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। একটি ছোট ছেলের কান্না শোনা গেল।

আর কি, শেষ হয়ে যায় বুঝি! টেনীরা থরথর কেঁপে ভাবছিল এইবার পিস্তলের আওয়াজ হবে। রমাবাই খুব সাহসী ও তৎপর বলতে হবে। এক নিমেষে পিছিয়ে গিয়ে বাঁ' হাতের পিতলের লাঠি বাঘের নাকের উপর ধরলো। মনে হ'ল একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠলো। বাঘটা ভীষণ চীৎকার করে এক লাফে অন্যদিকে গিয়ে রাগে গরগর করতে লাগলো।

সবশেষ খেলাটি আরো দারুণ। সিংহ বসলো মাঝখানে একটি

চৌকীতে, দু'পাশে দু'টি মাণিকজোড় বাঘ। রমাবাই বাঁ হাতে পিতলের লাঠি ও চাবুক একসঙ্গে নিয়ে ডান হাতটি বাঘের মুখে পূরে দিল, দুজনকারই! মনে হ'ল সিংহমশাই মিটিমিটি হাসছে দাঁত বার করে, —মজাটি দেখাবো, এস আমার কাছে!

পরে সিংহ হাঁ করলো, রমাবাই নিজের মুণ্ডটি সিংহের মুখের ভিতর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ব্যাণ্ড বাজছে না। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলো। টেনীরাও পরস্পরকে জাপটে দাঁড়িয়ে রইলো। কি যেন কি একটা অঘটন এখুনি ঘটে যাবে সুনিশ্চিত!

রমাবাই ধীরে ধীরে নিজের মাথা বার করে আনলো। ব্যাণ্ড খুব জোরে, বিপুল উৎসাহে বেজে উঠলো। আজকের মত সার্কাস শেষ।

সাত
খাঁচার পাখী

একটি আলাদা তাঁবুতে চারজনকে শুতে দেওয়া হয়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গলো বেশ বেলা করে। লব বললো,—চল দিদি, বাঘ-সিংহদের একবার দেখে আসা যাক, কি করছে।

টেনী উত্তর দিল,—চল, কিন্তু আজ আমাদের বাড়ি ফিরবার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটি খুব ভাল, না? আমাদের ঠিক বাড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবে।

কথা শেষ হতে সকলে যাবার উপক্রম করছে, এমন সময় একজন চাকর এসে বললো,—তোমাদের ডাকছেন কর্ত্তাবাবু।

চাকরের সঙ্গে সকলে বেরিয়ে এল। কালকের সেই ছোট তাঁবুতে চন্দ্ররাও বসে কি কাগজপত্র দেখছিল, চোখে চশমা দিয়ে, গম্ভীর ভাবে। বললো,—এস এস, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

সকলে চারপাশের চেয়ারে বসলো।—লোকটি বেশ মিষ্টি ভাবে বললো,—সার্কাস কেমন, খুব ভাল, না? তোমরাও সার্কাসে যোগ দাও না, বেশ মজা লাগবে। খাওয়া-থাকার সব ব্যবস্থা করে দেবো ভাল করে। আর কত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে। এর পরই যাবো কলকাতা, ভারী বড় সহর, দেখবার কত জিনিষ!

কুশ জবাব দেয়,—আমাদের বাড়ি ফিরবার ব্যবস্থা করে দিন। সার্কাস আমাদের ভাল লাগে খুব; কিন্তু মা বাবা এতক্ষণে বড্ড

ভাবছেন, বলে আসিনি কিনা! বাড়ি ফিরে যদি ওঁরা মত করেন তবে সার্কাসে এসে যোগ দিতে পারি।

লম্ বললো কুশকে,—সার্কাস করবে ত' স্কুল? পড়াশুনা করতে হবে না বুঝি? মুখ্যু হয়ে থাকবে? খাবে কি?

—সার্কাস করেও ত' কত লোক রোজগার করে। এই ত' এরাও করছেন—কুশ পালটা জবাব দেয়।

বেবী ব্যস্ত হয়ে মিনতি করে বলে,—না না, বাড়ি চল ভাই। মার জন্য মন কেমন করতে সুরু করেছে ভয়ানক।

লোকটি চুপ করে এদের কথা শুনে বললো,—দেখো সোজা কথার মানুষ আমি, স্পস্ট বলে দিচ্ছি। আমার নাম জান ত'—চন্দ্ররাও! এই নাম শুনলে মানুষ দূরের কথা এই সার্কাসের বাঘ-সিংহরাও থরথর করে কাঁপে। যাওয়া তোমাদের হবে না! তোমাদের নিয়ে আমি সার্কাসে নতুন নতুন খেলা দেখাতে চাই। বয়স কম ও চালাক আছ তোমরা, শিখবে চট্ করে। যদি ভালমানুষের মত কথা শোন আদর যত্ন পাবে, ভাল খেতে পরতে পাবে, আর তা না হলে—হাত উঁচু করে ভঙ্গি করে শেষ করলো—চাবুক সপাসপ্। এরকম অনেককে সায়েস্তা করে ছেড়েছি।

সকলে ভয়ে আঁৎকে উঠলো। মুখ চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

টেনীর গলা শুকিয়ে গিছলো। জোর করে এক ঢোক গিলে বললো,—আমরা ছোট ছেলেমেয়ে। এরকম ভয় দেখানো, জোর করা আপনার উচিত নয়। আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। এখনি চলে

যেতে দিন দয়া করে, নিজেরা বাড়ি ফিরে যাবো। না দিলে বাবা খবর পেয়ে আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন।

বাহাদুর মেয়ে বটে টেনী! সাবাস সাহস! কিন্তু চন্দ্ররাও? চন্দ্ররাও-এর সে কি হাসি! পৈশাচিক হাসি! সারা সহর যেন কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পে। চোখ থেকে চশমা খুলে, ঘোড়ার খুরের মত গোঁফ আঙ্গুল দিয়ে টানতে টানতে বলে,—ভয় দেখাচ্ছ আমায়? সাবাস মেয়ে! সাহস আছে তোমার। তোমায় নিয়ে সার্কাস জমবে বটে! জহুরী আমি—ঠিক জহর চিনে নিয়েছি। সার্কাসের তাঁবু থেকে কাক পক্ষীও তোমাদের সন্ধান পাবে না, নিয়ে যেতেও পারবে না। তোমাদের লম্ফঝম্ফ ইলেকট্রিক চাবুক ছোঁয়ালে বা সিংহের খাঁচায় পূরে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাগে টেনীর চোখদুটো জ্বলে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো,—যাচ্ছি আমরা, দেখি কি করতে পারেন। চল্ লব কুশ বেবী, এক্ষুণি চলে যাবো। মন্ত্র-চালিতের মত সকলে টেনীর কড়া হুকুমে উঠে দাঁড়ালো ও লাইন বেঁধে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

চন্দ্ররাও বসে তখন মিটি মিটি হাসছে।

প্রতিদিন সকালে সার্কাসের বড় তাঁবুতে কসরৎ শেখানো হয়। এখানেই চলে সন্ধ্যাবেলা খেলা দেখানো। যারা সন্ধ্যায় সার্কাস দেখে, ভাবে কি মজা সার্কাস করা, জীবনটাই এদের শুধু হাসি আর খেলা। তারা যদি সকালে এসে দেখে, দেখবে কত কষ্ট করে প্রতি জিনিষটি শিখতে হয়। মজা উড়ে যায়! কষ্টের শেষ থাকে না। পরিশ্রম করতে হয়, চেষ্টা করতে হয় বারবার ; না পারলে বকুনি, ধমকানি, গালাগালি,

মার পর্য্যন্ত খেতে হয়—যেমন জন্তু-জানোয়ার তেমনি মানুষকেও। চন্দ্ররাও ভারী জেদী, কড়া মানুষ, নিজে সব দেখাশুনা করে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে টেনীরা চট্‌পট্ বাইরে যাবার জন্য চলতে লাগলো। কোন রকমে এই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাক, পরে ভেবে ঠিক করা যাবে বাড়ি ফিরবার উপায়।

বেশীদূর যায়নি, দেখলো—কালকের সেই টিপু গরিলা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, মাতালের মত টলতে টলতে দাঁত বার করে। বেবী টেনীকে জড়িয়ে ধরলো। টেনী বেবীকে টানতে টানতে ও লব কুশকে ঠেলতে ঠেলতে পাশ কাটিয়ে অন্য দিক দিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সক্ষম হ'ল না।

টিপু বড় বড় লোমওয়ালা এবড়ো খেবড়ো হাত দু'টি প্রসারিত করে সারা পথ আগলে দাঁড়ালো ও মাত্র ভয়ের ইঙ্গিতে ঠেলে নিয়ে ঢোকালো সেই বড় তাঁবুর ভিতর। বড় তাঁবুতে তখন কসরৎ চলেছে পুরাদমে। চ্যাং উল্টে পাল্টে নানা ভঙ্গি করে বসছে শুচ্ছে, সুজিৎ-কুমার প্যারালাল বারে দুলছে, এলিজা তারের উপর তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করছে, আর রামাবাই একটা চেয়ারে গুম্ হয়ে বসে আছে। কালকের পাগল দু'টো আম্বো জাম্বো এখন বেশ ভালমানুষ সেজে সকলের তদারক করছে, সাহায্য করছে।

এরা ঢুকতেই জাম্বো এগিয়ে এসে বললো,—তোমাদের কার কি খেলা কর্ত্তা ঠিক করে দিয়েছেন? শিখতে হবে আজ থেকেই। ঐ ছোট্ট মেয়েটি কি নাম ওর—বেবী? বেশ ও শিখবে চ্যাংএর কাছে হাড়-গোড় ভাঙ্গা খেলা। যাও ৯কার যেমন ডিগবাজী খায় করগে।

আর তোমরা দু'জন একরকম দেখতে ; যাও এলিজার কাছে দু'পাঁচবার চিৎপটাং হওগে। তোমার নাম কি গা' লক্ষ্মী মেয়ে, টেনী ?—ভাল, তুমি শিখবে ঘোড়া হাতী-চড়া কসরৎ। বুদ্ধি আছে শিখে নেবে ঠিক। দাঁড়াও একটু, রজনীকান্ত এখনো আসেনি। আর দু'একটি নূতন খেলা তোমরা চারজন ও টিপু করবে হুকুম দিয়েছেন কর্ত্তা ; কিন্তু সে আজ হবে না, সাজসরঞ্জাম কিনে আনতে হবে। কাল থেকে দেখা যাবে।

পাথরের মানুষের মত চুপ করে চারজনে সব শুনলো। মনে পড়লো মা বাবার মুখ, মনে পড়লো সেখপুরা পাহাড়ের স্বাধীনতা। টেনী কি একটা বলতে যাচ্ছিল ; চোখে পড়লো টিপু দু'হাত বুকে রেখে দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে। টেনী বললো না কিছু, বলে কি হবে ?

এর পর থেকে চলে কসরৎ শেখার পালা। প্রথম প্রথম করতে বেশ লাগে, মজা হয় আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু একই জিনিষ নিজেদের মধ্যে বার বার করা কষ্টকর, বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি মিশানো থাকে ভয়, ধমকানি ও বাড়ি ফিরে যেতে না পাওয়ার দুঃখ। বাড়ির কথা মনে হ'লে বুক ভেঙ্গে যায়। মনে হয়—কত দিন, কত যুগ যেন বাড়ি-ছাড়া! মার মিষ্টি ডাক আর বাবার মজার গল্প কত দিন শোনা হয়নি! পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়, কত কল্পনা মনে ভেসে আসে। একটা এরোপ্লেন যদি টুপ্ করে এসে সামনে নামে ত'· চট্‌পট্ উঠে পড়া আর হাওয়ায় উড়ে যাওয়া, সেখপুরায় বাড়ির সামনে কোলাহল করে নামা।

রাত্রিবেলা যদি কোন রকমে সরে পড়ে ষ্টেশনে পৌছান যায়, একটা না একটা ট্রেন মিলবেই ; কিন্তু পালাবার উপায় কোথা ?

অষ্টপ্রহর কত জোড়া চোখ একসঙ্গে নজর রেখেছে! একটু নিশ্চিন্ত ভাবে নড়াচড়া করবার উপায় নেই।

টিপু যেন মানুষের চেয়েও বেশী সচেতন, মারধোর করে না, আঁচড়ে কামড়েও দেয়নি কোনদিন; তবু মনে হয়, কিছু বেয়াদ্‌পি করলেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। টিপু সব বুঝতে পারে, বুঝাতেও পারে স্পষ্ট ভাবে। ওকে এসব শেখালো কে—ঐ চন্দ্ররাও? কি দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মানুষ!

নিয়মমত রুটিন অনুযায়ী কসরৎ শিখতে হয়। সৈনিকের মত মাপা জোকা খাওয়া বসা, কলের মত হিসাব করে মানুষদের সাথে কাজ ব্যবহার। ভুল চুক হবার বেশী-কম হবার জো নেই। সন্ধ্যায় সার্কাস আরম্ভ হ'লে আলাদা জায়গায় বসে দেখতে হয়। দু'দিন বাদে নিজেরা ভাল করে শিখে এমনি এত লোকের সামনে খেলা দেখাতে হবে। ভাবলে আনন্দ হয় আবার ভয়ও হয় একটু একটু। যদি খেলা দেখাতে ভুল হয়, দুম্ করে পড়ে যায়,—তাহলে?

চ্যাং মানুষটি বড় ঠাণ্ডা। বেবীকে কত কষ্ট করে মিষ্টি কথা বলে শেখায়। বেবী যখন সত্যি ৯-কারের মতন বুকের উপর ভর দিয়ে পা'দুটি সমান বেঁকিয়ে উঁচু করে থাকে, ভারী সুন্দর দেখায়। তবে কষ্ট হয় খুব, মুখে চোখে রক্ত নেমে আসে। আবার বেবীকে কাঁধে করে সেই ছুরি শূন্যে ছোঁড়া ও লুফে নেওয়া প্র্যাক্‌টিস্ করছে আজকাল। একবার যদি ছুরির ফলা বেবীর শরীরে বিঁধে যায়?

লব-কুশের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন নয়। এলিজা খুব খিটখিটে, ধৈর্য্য নেই একেবারে। একটু ভুল হলে যা তা বলে, দূর দূর করে;

চন্দ্ররাওকে বলে দেবার ভয় দেখায়। লব-কুশ করছে কিন্তু খুব উঁচুদরের খেলা। যেন কলের তৈরী একজোড়া একই রকম দেখতে মানুষ! হাবভাব, ভঙ্গি সমস্ত মিলে চমৎকার দেখবার মত জিনিষ।

রজনীকান্ত কথা বলে কম। বেশীর ভাগ চোখের ইশারায় সারে। যখন রাগে, ওর চোখের দিকে না তাকালেই ভাল হয়। সারা দেহে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, সেই ঘৃণার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি। একদিন টেনী উপরি উপরি তিনবার পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। রজনীকান্ত টেনীর দিকে একবার তাকিয়ে হাতের চাবুক মাটিতে আছড়ে ফেলে তাঁবু থেকে চলে গেল। টেনীর সে কি কান্না! এতবড় অপরাধ ও এমন ভীষণ শাস্তি যেন জীবনে আর ঘটেনি কখনো! এর চেয়ে চাবুক দিয়ে মারলে টেনীর লাগতো কম।

টেনীকে কিন্তু ভারী সুন্দর দেখায় ওর নতুন পোষাকে। চিনতে পারা যায় না যে, এ সেই শেখপুরার ছোট মেয়ে টেনী। গলায়, কাঁধে, কোমরে—সিল্কের ঝালর দেওয়া সবুজ আঁটা পোষাকে ওকে স্বর্গের পরীর মত সত্যিই দেখায়। এর পাশে এলিজা সৌন্দর্য্যে ম্লান হয়ে যায়। এই জন্য বোধহয় এলিজার হিংসা আজকাল এত বেড়েছে, খিটখিটেমির শেষ নেই, লব-কুশের উপর শাস্তির পরিমাণও বেড়েছে।

সবচেয়ে অসহ্য কিন্তু রমাবাই। নামটি বেশ সুন্দর কিন্তু মানুষটি বড় খারাপ, মন অত্যন্ত সংকীর্ণ। ওর কাছে শিখতে হয় না কিছু, তবু ওর ফাইফরমাশ খাটতে হবে দিনরাত। সে যে কতরকমের, তার ইয়ত্তা নেই! এতটুকু মিষ্টি কথা বলে না, শুধু চাকরের মত হুকুম

করে। একদিন টেনী ওর চুল আঁচড়ে দিতে দিতে লাগিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছা করে নয়, এমনি লেগে গেছে।

রমাবাই রেগে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল্ল সিংহের খাঁচায় পূরে দিতে। শুনবে না কোন ওজর-আপত্তি অনুনয়-বিনয়। শেষে লব কুশ বেবী হাউমাউ করে কেঁদে, পায়ে ধরে মাফ্ চেয়ে টেনীকে বাঁচায়। একবার টেনী চন্দ্ররাওকে বলে দিল, কিন্তু ফল হ'ল উলটো। চন্দ্ররাও নিজেই রমাবাইকে ভীষণ ভয় করে, কোন কথার প্রতিবাদ করে তর্ক করতে সাহস করে না। রমাবাই যা খুশী, যত খুশী, করতে পারে। ওদিকে থাকেন সবচেয়ে বাবুয়ানীতে, আরামে।

আম্বো-জাম্বো অন্যের সামনে গম্ভীর চুপচাপ থাকে, কিন্তু আড়ালে টেনীদের সঙ্গে খুব ভাব করে ফেললো। ওরা দুজনে সত্যি বড় ভাল মানুষ। ক্লাউন সেজে পাগলামি করলে কি হয়, আসলে খুব পাকা খেলোয়াড়, ঐরকম ভান করে। আড়ালে চন্দ্ররাওকে বলে যমদূত, রমাবাইকে শূর্পণখা, এলিজাকে ছিঁচ্‌কাঁদুনী, আর রজনীকান্তকে ক্যাব্‌লাকান্ত!

আম্বো-জাম্বো লুকিয়ে টেনীদের খাবার-দাবার দেয়, চক্‌লেট কিনে দেয়, মন খারাপ হলে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দেয়। সময় পেলেই কত কত গল্প করে ওদের সঙ্গে! নিজেদের জীবনেরও অনেক কথা বলেছে। ছোট বেলায় একই গ্রামে পাশাপাশি থাকতো দুজনে, খুব ভাব ছিল। চন্দ্ররাও তখন খুব ছোট একটি দল নিয়ে সার্কাস দেখিয়ে বেড়াতো; ওদের গ্রামে সে আসে দু'চারটি মানুষ ও জন্তু-

জানোয়ার নিয়ে ; এক এক পয়সা টিকিট। আম্বো-জাম্বো তিন-চার দিন দেখতে গেছলো। সার্কাসের দল খেলার শেষে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আম্বো-জাম্বোকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। চন্দ্ররাও ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়েছিল। সার্কাসে চাকর, ঘোড়ার সহিস, এরকম অনেক কাজ ওদের করতে হয়েছে। পরে নিজেদের বুদ্ধির বলে ক্লাউনের কাজ পেয়েছে। এখনও ওদের অন্য সবাইকে কসরৎ করবার সময় সাহায্য করতে হয়, টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ রাখতে হয়।

আম্বো দুঃখের হাসি হেসে নিজেদের কাহিনী শেষ করে বলে,—আমাদের আসল নাম আম্বোও নয় জাম্বোও নয়, পরে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। এখন আসল নাম বললে মানবে কে? চিনতে পারবে না। তারা শুধু সার্কাসের ক্লাউন বৈ ত' না!

টেনী একদিন ওদের বলে,—আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করে দাও।

—ওরে বাবা! গর্দ্দান যাবে আমাদের। যমদূত ও শূর্পণখা আস্ত রাখবে না, টুকরো টুকরো করে বাঘ সিংহদের খাইয়ে দেবে। তবে সুবিধা যদি হয়, নিশ্চয়ই।

দশ

অন্য বিশেষ রজনী

সব ঠিকঠাক—আসছে শনিবার থেকে টেনীরা খেলা দেখাবে। কাগজে ছাপানো হয়ে গেল, হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হ'ল। টেনী বেবীদের আসল নাম গোপন রেখে এক একটি নতুন নাম দেওয়া হ'ল, এবং ঠিক হ'ল 'মেকাপে' এদের মুখ চোখ বদলে নামানো হবে,—কেউ চিনতে না পারে।—চন্দ্ররাও ভারী ধড়িবাজ, বড় হুঁসিয়ার মানুষ! সবদিক আটঘাট বেঁধে কাজ করা অভ্যাস।

দু'দিন আগে থেকে খুব জোরসে কসরৎ চললো। কোন রকম ভুলচুক, কোন রকম বেসামাল না হয়ে পড়ে। সার্কাস দেখানো সহজ নয়, তামাসাও নয়। লোকে পয়সা দিয়ে দেখতে আসে। পয়সার মূল্য অনুযায়ী আমোদ না পেলে আর কখনও আসবে না, আসবে কেন?

উত্তেজনায় এবং খেলা দেখাবার আনন্দে টেনীরা প্রায় বাড়ির কথা ভুলে গেল শেষের দিকে। শুধু একটি চিন্তা দিনরাত যে ভাল করে দেখাতেই হবে। আম্বো-জাম্বো আগাগোড়া সাহায্য ও উৎসাহ দিতে লাগলো।

অনেক সময় এদের খেলা দেখে অন্যদের স্বীকার করতে হয়েছে যে, যদি ঠিক এইরকম দর্শকদের সামনে দেখাতে পারে কোন লজ্জা বা ভয় না পেয়ে, তাহলে সত্যি দেখবার মতই জিনিষ

হবে ; পরে দেশময় সুখ্যাতি ও নাম ছড়িয়ে যাবে এবং যখন কলকাতায় সার্কাস গিয়ে পৌঁছাবে, তখন সারা সহরের মানুষ এসে ভেঙ্গে পড়বে।

চন্দ্ররাও এসব দেখেশুনে আজকাল ব্যবহার অনেক ভাল করছে। কিন্তু এলিজার হিংসা যেন বেড়েই যাচ্ছে। এই সেদিন লবকে চটাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিল বিনা কারণে। লবও ছাড়বার ছেলে নয়। আঁচড়ে কামড়ে ঠেলেঠুলে ব্যতিব্যস্ত করে মেরেছিল, শেষে অন্যেরা এসে থামায়।

আর রমাবাই ? ওর কথা না বলাই ভাল। পৃথিবীর কোন মানুষকে ও ভালবাসে না, লোককে ফরমাস করা, জ্বালাতন করা একমাত্র কাজ। ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কিছু নেই।

শনিবার সন্ধ্যায় সার্কাস আরম্ভ হ'ল। আজকে বিশেষ রজনী, তাই বেশী ভিড়। অনেক লোক এসেছে আত্মীয়-স্বজন ছেলেমেয়ে নিয়ে, নতুন নতুন খেলা দেখবার আশায়। চারিদিকে গরম জামা-কাপড় শাল-দোশালার ছড়াছড়ি। চীনাবাদাম, চকলেট ও কমলালেবুর দাম চড়ে চারগুণ! ব্যাণ্ড এতক্ষণ বাইরে মঞ্চের উপর বাজছিল ; প্রথম ঘণ্টা পড়তেই, ভিতরে এসে নিজেদের জায়গায় বসে প্রবল উৎসাহে বাজাতে লাগলো।

চন্দ্ররাও সবচেয়ে দামী জামাকাপড় পরে সবগুলি মেডেল বুকে ঝুলিয়ে তদারক করছে ব্যস্তভাবে। সকলকে বার বার মনে করিয়ে দিল খেলা যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, অনেক লোক এসেছে। উত্তেজনায় প্রসিদ্ধ গোঁফজোড়াটি নাচতে লেগেছে। টেনীদের সকলের পিঠ

চাপড়ে বললো,—ভয় নেই কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে; যেমন শিখানো হয়েছে করলেই হবে। ভুল হলে কিন্তু—

নাকের কাছে আঙ্গুল নেড়ে দেখালো। মানে—ইলেকট্রিক চাবুক সপাসপ্।

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ধবধবে সাদা পোষাক পরে বেবী নামলো—চ্যাং সঙ্গে। এদের দেখেই হাততালি পড়লো খুব, বিশেষ করে যখন ছোট্ট বেবী ছোট্ট মাথাটি নীচু করে অভিবাদন জানালো। চমৎকার করলো বেবী! ওর শরীরে যেন হাড় একখানিও নেই! আশ্চর্য্য যে এমন বাঁকাচুরা মানুষ আবার হতে পারে? গম্ভীর মুখ করে বেবী একের পর এক সমস্ত সুন্দর ভাবে করে গেল,—ভীষণ ছুরি লোফা পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝে ড্যাবড্যাব্ করে লোকেদের দিকে দেখছিল,—কিন্তু ভয় পায়নি কিছুই।

নৌকার মত বেঁকে বেবী শক্ত হয়ে রইলো। চ্যাং একটা লাঠি বেবীর পেটে লাগিয়ে, উঁচু করে বন্‌বন্ ঘুরিয়ে দিল। বেবীর পোষাকের তলায় একটি মোটা শক্ত চামড়ার বেল্ট লাগানো ছিল, দর্শকরা কেউ দেখতে পেল না। এই ছিল বেবীর শেষ খেলা। চ্যাং শূন্যে ছুঁড়ে যেই লুফে কোলে করে নিল, সে কি হাততালি! থামতে চায় না অনেকক্ষণ!

লবের হলদে গেঞ্জির আঁটা পোষাক ও লাল জাঙ্গিয়া। কুশের ঠিক উলটো, লাল পোষাক ও হলদে জাঙ্গিয়া। এলিজা আগের মতনই বাদামী পোষাক ও ব্লু জাঙ্গিয়া পরে, একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো। লব-কুশকে দেখাচ্ছিল যেন একটি সুন্দর ছেলের আরেকটি প্রতিবিম্ব,



আগে কে স্বপ্নেও ভাবতে পারতো টেনী এমন কায়দা করে ঘোড়ায়
চড়তে পারে !

—৫৮ পৃষ্ঠা

আর্শীতে নিজের মুখ যেমন দেখায়। শুধু পোষাকের তফাতে ধরা যায় দু'জন মানুষ।

যন্ত্র চালিতের মত তিনজনে তারের উপর খেলা দেখালো। জাপানী ছাতা এর হাত থেকে ওর হাতে নাচতে লাগলো, একজনকে টপ্‌কে আরেকজন এপাশে ওপাশে লাফিয়ে পড়লো, যেন ওরা শক্ত চওড়া মাটির উপর কসরৎ করছে—সরু দোলা তারের উপর নয়।

লবের একবার পা পিছলে গেল সড়াৎ করে, আরেকটু হলেই পড়ে যেত একেবারে সকলের সামনে চিৎপটাং। অন্যদিকে ঝুঁকে ব্যালান্স্‌ করে সে যাত্রা অনেক কষ্টে রক্ষা পেল। আরেকটু হলেই হয়েছিল আর কি। এলিজার টিট্‌কারী এবং চন্দ্ররাওএর চাবুক ভোগ করতে হ'ত।

তারের খেলার পর তিনজনে গিয়ে উঠলো সেই উঁচু ঝোলানো দোলাতে। ওদের এতটুকু-টুকু দেখাচ্ছিল। ভয় হয় না? যদি পড়ে যায়? কিন্তু সার্থক শিক্ষা পেয়েছে বলতে হবে। এতটুকু ভুলচুক করলো না—পরের পর করে গেল নিয়মমাফিক। দোলনার দড়িতে পা আটকে দু'কোণে লব ও কুশ মাথা নীচু করে ঝুলে রইলো, দুজনার হাতে হাত ধরে ঝুলতে থাকলো এলিজা। এলিজার অত বড় দেহটাকে ওরা যে কি কায়দায় দোলাতে খেলাতে লাগলো, সে তা দেখলে বর্ণনা করা যায় না! মনে হয়, আর পারে না—এবার বুঝি সবশুদ্ধ ছিঁড়ে নীচে-পাতা জালের উপর ঝপাঝপ্‌ এসে পড়বে; কিন্তু তা নয়, এক একজন করে ডিগ্‌বাজী দিয়ে জলে 'ডাইভ' খাওয়ার মত

জালে এসে নামলো। চটাপট শব্দ বহুক্ষণ ধরে জানাতে লাগলো যে, লোকেদের ভাল লেগেছে খুবই।

ইন্টারভ্যালের ঠিক আগে টেনীর খেলা। চারিপাশে কোঁচানো ঝালর দেওয়া পোষাকে মনে হচ্ছিল টেনী যেন সত্যিকারের মানুষ মেয়ে নয়, কোন ছবিতে-আঁকা মূর্ত্তি, এমনি সুন্দর! আগে কে স্বপ্নেও ভাবতে পারতো টেনী এমন কায়দা করে ঘোড়ায় চড়তে পারে! শুধু চড়া নয়,—ঘোড়া ছুটছে, পিঠের উপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, একপায়ে ভর দিয়ে বাজনা বাজাতে হবে ব্যাণ্ডের তালে তালে, এক ঘোড়া থেকে আরেক ছুটন্ত ঘোড়ায় লাফিয়ে পড়তে হবে! পরে কাঠের পুতুলের মত শক্ত হয়ে রইলো, হাতী শুঁড়ে করে ধরে ছুটতে থাকলো! মনে হয়—এই পড়ে গেল! পড়ে গেলে হাতীর পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে যেত।

রজনীকান্তের মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় গর্ব্বে ঘাড়টি ফুলিয়ে খুশী মনে খেলাচ্ছে! চোখের দৃষ্টি তত তীব্র নয়, বেশ কোমল। লোকেদের সবচেয়ে ভাল লাগে টেনীর মুখের মিষ্টি হাসিটি,—সব সময়ে হাসছে।

খেলার শেষে রজনীকান্ত টেনীর হাত ধরে সামনে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে 'বো' করে অভিবাদন জানালো। রজনীকান্তের সঙ্গে অনেকেই খেলা দেখিয়েছে কিন্তু এতদিনে এত বড় সৌভাগ্য কারুর হয় নি। এর চেয়ে বড় প্রশংসা, টেনী আর কি আশা করতে পারে?

শেষের দিকে আরেকটি নতুন খেলা সকলে দেখালো। ঘন্টা পড়তে সবুজ পর্দ্দা সরিয়ে সব প্রথমে এল টেনী, খুব উঁচু একটি

একচাকার সাইকেলে। দু'হাত দু'পাশে ব্যালান্স করতে করতে পাখীর মত উড়ে এল। পিছনে এল লব কুশ বেবী। সারি সারি।

ও আবার কে সবচেয়ে শেষে? আরে টিপু! টিপু একচাকার সাইকেল চালাচ্ছে অন্যদের মত! তাজ্জব কাণ্ড! এতটা কিন্তু আশা করা যায় না। আবার এই দলের সঙ্গে এসে হাজির নানা রকম অঙ্গভঙ্গি ও আওয়াজ করতে করতে,—কারা? সব সময়ে অঘটন ঘটাবার বাহাদুর দুটি,—আম্বো ও জাম্বো। না, এতটা সত্যি আগে ভাবা যায়নি। সার্কাসটি উঁচুদরের স্বীকার করতে হয়।

উঁচু উঁচু, সেই অনেক উঁচু, তিনমানুষ সমান একচাকার সাইকেলে চারটি ছেলেমেয়ে ও একটি গরিলা। নানা ভাবে এঁকে বেঁকে, ছুটে দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে, কায়দা দেখাতে লাগলো, যেন ওরা এক সূতায় গাঁথা! আর হাসাচ্ছে, বেদম হাসি হাসাচ্ছে, দু' ঠ্যাংএ মাটির উপর অনুকরণ করে আমাদের আম্বো-জাম্বো। একচাকার সাইকেল চড়া সোজা কাজ নয়, বিশেষ করে অত উঁচু যখন। এক-একবার এক-একজন টাল খেয়ে যাচ্ছে আর বাঁচিয়ে দিচ্ছে ক্লাউন দু'জন। দেখে কিন্তু মনে হয়—ওরা নিজেরাই খালি খালি পড়ে যাওয়ার ভান করছে, কায়দা এমনি চমৎকার।

চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ইচ্ছে করে কাছে এসে লব চুপিচুপি বললো,—দিদি, তোমার পা দিয়ে রক্ত—

শেষ করতে পারলো না, নিয়ম অনুযায়ী দূরে সরে যেতে বাধ্য হ'ল।

টেনীর হুঁস্ ছিল না শরীরের উপর। দেখে সত্যি তাই, পা'

দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। নিশ্চয় সাইকেলের প্যাডেলে কখন কেটে গেছে! এখন কি করা যায়? খেলা বন্ধ রেখে নেমে পড়া অসম্ভব, সব মাটি হয়ে যাবে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল। পা' তুলে এক পায়ে চালাতে চালাতে হাতের রুমাল টপ্ করে বেঁধে দিল, দু'দুবার টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। লোকেরা ভাবলো এক নতুন রকম খেলা বুঝি, হাত তালি দিয়ে উঠলো খুব জোরে। জাম্বো দেখেছিল ব্যাপার কি! সেজন্য টেনীর কাছে কাছে ঘুরে তামাসা করতে লাগলো, যদি পড়ে যায় ধরে ফেলবে বলে। টেনীর পা জ্বালা করছিল কিন্তু উপায় কি? টেনী আবার মন দিয়ে খেলা দেখাতে লাগলো।

খেলা শেষ হলে লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো,—আরো আরো! সুতরাং আবার খানিকক্ষণ দেখিয়ে শেষ করতে হ'ল।

অন্যদিনের মত সেদিনও বাঘ সিংহের খেলা দেখিয়ে সার্কাস শেষ হ'ল। লোকেরা বলতে বলতে বাড়ি ফিরে গেল যে, আবার দেখতে হবে; এ জিনিষ একবার দেখলে আশ মেটে না। সত্যি সার্কাসটি বড় চমৎকার!

এগারো

গোয়েন্দা রজনীকান্ত

দিনের পর দিন সার্কাস চলে। দিন দিন বেড়ে যায় লোকের ভিড়। তিল ধরবার জায়গা থাকে না। আগে থেকে সমস্ত সিট রিজার্ভ হয়ে যায়, কত লোক রোজ ফিরে যায় দেখতে না পেয়ে।

টেনীদের খাতির বেড়ে গেছে। ওদের জন্যই যে টাকা বেশী রোজগার হচ্ছে, সে কথা চেপে রাখবার উপায় নেই ; সকলে জানে। খাতির বাড়লে কি হয়, 'একটি কথা' কিন্তু উচ্চারণ করা নিষেধ। টু' শব্দ করলে ধমকানো আর ভয় দেখানো আরম্ভ হয়ে যাবে। সে কথাটি কেউ মুখে আনতে পারে না,—বাড়ি ফিরবার কথা!

টেনীদের মোটের উপর ভালই লাগছে। কার না লাগে? নাম করা কি যে সে ব্যাপার! এই যে হাজার হাজার লোক কাতারে কাতারে দেখতে আসছে, সুখ্যাতি করছে, তাঁবু ফাটিয়ে হাততালি দিচ্ছে,—এ কি সহজ কথা? কিন্তু তবুও মানুষ ত', বাড়ির জন্যে কার না মন কেমন করে! কতদিন বাড়ি ছেড়ে থাকা যায়, তা সে যত সুখ যত আনন্দই হোক না কেন! মা বাবার কথা দিনের মধ্যে কতবার করে মনে পড়ে যায়! হায় শেখপুরা, কত স্বাধীনভাবে জীবন কাটতো সেখানে!

এ যেন খাঁচার পাখী! সময় মত খাবার আসছে খাও, নিয়ম মত শিষ দাও টুই-টুই-টুই, আর হুকুম মত ল্যাজ তুলে তুলে তুড়ুক্ তুড়ুক্

নাচ! এদের জীবন কি ঠিক সেই রকম নয়? তফাৎ কোথায়? কিচ্ছু নেই। প্রায়ই চারজনে আলোচনা করে কি করা যায়, কি ভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়া যায়! আম্বো-জাম্বো বসে চুপ্ করে শোনে ওদের কথা, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু উপায় বাৎলাতে পারে না এই বদ্ধ খাঁচায় পাখীদের উড়ে যাবার বিষয়। এর কোন উপায় নেই; সুতরাং দুঃখ কর আর চুপ করে বসে থাক, খাও দাও মন দিয়ে কাজ করে যাও—বাস্! আর কি চাও?

কাগজে হাণ্ডবিলে ছাপা বেরুলো,—শেষ সপ্তাহ, শেষ সপ্তাহ! সাতদিন বাদে সার্কাস এখান থেকে চলে যাবে কলকাতায়, বাংলার রাজধানী কলকাতা সহরে। বড়দিন আসছে যে! বড়দিনে কলকাতার চেয়ে সেরা আমোদ-প্রমোদ দেখাবার, টাকাপয়সা লোটবার জায়গা আর আছে নাকি পৃথিবীতে?

টেনীদের ভাবনা বেড়ে গেল। আরও দূরে চলে যাচ্ছে শেখপুরা থেকে, আরো দূরে। ফিরবার হবে কি? অবশ্য মামারা থাকেন কলকাতায় কিন্তু ঠিকানা ত' মনে নেই! কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এইটুকু মনে আছে। এতে খবর পাওয়া যাবে কি করে? এক যদি মামাবাবু দেখতে আসেন সার্কাস; কিন্তু চিনবেন কি করে? 'মেকাপে' ত মুখ বদ্‌লে খেলা দেখাতে হয়! আর সারি সারি লোকের ভিড়ের মধ্যে থেকে মামাবাবুকে চিনে ডেকে নেওয়া শিবের অসাধ্য কাজ। কি হবে?

আম্বো-জাম্বো চুপ্ করে শুনে যায়, বলে না কিচ্ছু; মিছে সান্ত্বনা কতদিন দেওয়া যায়? চুপ করে থাকাই ভাল।

কলকাতা যাবার দু'দিন আগে। নিশুতি অমাবস্যার রাত। সার্কাসের তাঁবুগুলি প্রকাণ্ড কালো পাহাড়ের মত নিশ্চল নিশ্চিন্তভাবে মাটির উপর পড়ে আছে। মানুষেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। জন্তু-জানোয়ারেরাও ঘুমে অচেতন। ঘুমন্ত আওয়াজে মাঝে মাঝে স্থানটি মুখর হয়ে আবার চুপ করে যাচ্ছে। কোথায় ঘোড়া পা ঠুকলো ঠক্ ঠক্ করে, কখনো বা ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সিংহমশাই, বাঘের গলা ঘড়ঘড়ানি সময় সময় শোনা যায়—আবার সমস্ত চুপ, একেবারে নিস্তব্ধ !

সুজিতের তাঁবুতে সুজিৎকুমার ও টিপু দুজনে পাশাপাশি ঘুমায় দুখানি খাটে। একটি ছায়ামূর্ত্তি সাবধানে ধীরে ধীরে এসে খুব সাবধানে উঁকি মেরে ভিতরে দেখে নিয়ে সরে গেল। ছায়ামূর্ত্তি সন্তর্পণে টেনীদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালো, তাঁবুর সঙ্গে গা মিশিয়ে চারিদিকে ভাল করে দেখলো, কান পেতে অনেকক্ষণ কি যেন শুনলো !

চারিদিকে অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। কালো সাদা মেঘের টুকরো সারা আকাশ ঢেকে দিয়েছে, একটি তারাও দেখা যায় না। ছায়ামূর্ত্তি সাবধানে টেনীদের তাঁবুর ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু পরে ছায়ামূর্ত্তি বেরিয়ে এল। পিছনে পিছনে চারটি ছোট ছোট ছায়ামূর্ত্তি, সব শেষে আরেকটি বড়—লাইন বেঁধে চারিদিকে সতর্ক ভাবে দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল। সুজিৎকুমারের তাঁবুর সামনে যেন হাওয়ায় পা ফেলে বেশী সাবধানে বেরিয়ে গেল, একটুও শব্দ হ'ল না।

মাঠের শেষটায় এসে প্রথম ছায়ামূর্ত্তি ঝুঁকে তার পিছনের ছায়া-মূর্ত্তিকে চুপি চুপি কানে কানে বললো,—টেনী, সোজা চলে যাও। ঐ রাস্তা, ষ্টেশনে আধঘণ্টা বাদে ট্রেন ছাড়বে।

টেনীও ঠিক তেমনিভাবে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললো,—আম্বো তোমাদের দুজনের দয়া জীবনে ভুলবো না। বাড়ি ফিরে তোমাদের কথা মনে থাকবে চিরকাল। তোমরা আমাদের পরম বন্ধু।

চারটি ছোট ছায়ামূর্ত্তি মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। বড় দুটি যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হ'ল যেন হাত দিয়ে চোখ মুছলো। অন্ধকারে ভাল করে দেখা গেল না।

পথ একেবারে নির্জ্জন। কোন মানুষ চলাচল করছে না। একটি গাড়ির টুপ টুপ শব্দ দূরে শোনা যায়,—কারা ষ্টেশনে যাচ্ছে!

কিছুদূর এসে লব বলে,—দেখ দিদি, কে যেন আসছে!

হ্যাঁ সত্যিই ত', উলটো দিক থেকে একটি মানুষ আসছে পা পর্য্যন্ত লম্বা ওভারকোট পরা, মাথায় পট্টি বাঁধা, হাতের লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে। রাস্তার আলোতে মাত্র এই দেখা গেল, চোখ-মুখ দেখা যায় না।

টেনী বলে,—কাজ নেই বাপু সামনাসামনি হয়ে। যদিও চেনা লোক কেউ নয়, তবু সাবধান হওয়া ভালো। এস, আমরা এই নিমগাছটির আড়ালে যাই, চলে গেলে আবার যাব।

সকলে গিয়ে নিমগাছের গুঁড়ির পিছনে লুকিয়ে বসে পড়লো।

লোকটি সোজা যেতে যেতে নিমগাছের কাছে এসে হঠাৎ এক লাফ মেরে এদের সামনে এসে হাজির। ভয়ে সকলে এমন বিহ্বল



ভয়ে সকলে এমন বিহ্বল হয়ে পড়লো যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে ! —৬৫·পৃষ্ঠা

হয়ে পড়লো যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে! কথা বলা দূরের কথা, সারা দেহে পক্ষাঘাত লেগে গেল।

—কি কোথায় যাওয়া হচ্ছিল চুপিচুপি?—রজনীকান্তের মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

সুর করে রজনীকান্ত আবার বলে,—তাই বলি গুটি গুটি যাচ্ছে কারা, মদ খেলেও মাতাল আমি সহজে হই না বাপধন, বুঝলে? মাইল দূরে দেখতে পাই। কর্ত্তার হুকুম—রাত্রে কেউ তাঁবু ছেড়ে বেরুতে পাবে না কোনদিন। সে কি আর হয় রে বাপু? রজনীচন্দর মাঝে মাঝে একটু আধটু নেশা না করলে বাঁচে কি করে? তাই গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি পাশ-বালিশটিকে লেপ মুড়ি দিয়ে নিজের জায়গায় শুইয়ে। সব্বাই ভাবে রজনীচন্দর ঘুমুচ্ছে—হা হা হা! আজ আবার তিন-তিনটে চৌকিদার ছুটি নিয়েছে—ভারী সুযোগ! ভাবলাম, একটু নেশা করে আসি। যাক আমিও ধরা পড়লাম, তোমরাও ধরা পড়ে গেলে। চল বাপু, ঘরে ফিরে। তোমাদের ধরে নিয়ে গেলে কর্ত্তা হয়তো আমার কসুর মাপ করবে, চাই কি—দু-পাঁচটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবে! টিপু ব্যাটা যে বড় আজ ঘুমুচ্ছে, হ'ল কি তার? একটু আওয়াজ পেলেই ত' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এত গম্ভীর রজনীকান্ত, অথচ মদ খেয়ে এ কি বকুনি! বেবীর হাত খপ্ করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো। মাতালের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, কাকুতি-মিনতিতেও ফল হ'ল না। এদিকে বেবীকে একলা ফেলে রেখে ছুটে পালানো যায় না। অগত্যা ফিরে যেতে হ'ল রজনীকান্তের সঙ্গে।

সকালে উঠে রজনীকান্ত সব কথা চন্দ্ররাওকে বলে দিল, বললো না শুধু নিজের মদ খাওয়ার কথা।

সেখানে রমাবাই বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল, হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে বলে উঠলো,—দাও ওদের সিংহের খাঁচায় পূরে দাও, এক্ষুণি দাও বলছি, বেয়াদব নিমক-হারামের দল! এত যত্ন করে খাওয়ানো পরানো—ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে! এই তার পরিণাম!

চন্দ্ররাও ভাবছিল, কিন্তু ভাববার সময় মিললো না। রমাবাই-এর চীৎকারে হুকুম দিল ওদের ধরে নিয়ে আসতে সিংহের খাঁচার কাছে।

দু'মিনিট বাদে সার্কাসের যত মানুষ সিংহের খাঁচার সামনে এসে হাজির। টেনীরা চুপ্ করে শুনলো চন্দ্ররাও-এর বকুনি ও রমাবাই-এর চীৎকার। বললো না একটি কথাও,—রজনীকান্তের মদ খাওয়ার কথাও না। আম্বো-জাম্বো শুকনোমুখে নিস্তব্ধ পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো। আম্বো কি একটা বলতে যাচ্ছিল, জাম্বো কাঁধে হাত দিয়ে টেনে বাধা দিল।

চন্দ্ররাও হুকুম দিল খাঁচার দরজা খুলে ওদের ভিতরে পূরে দিতে।

সিংহমশাই প্রথমে এত লোকজন ও চীৎকারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিছলো। এত সকালে ব্যাপারখানা কি! নিতান্ত বিরক্তভাবে গর্গর্ করে প্রতিবাদ জানাতে লাগলো।

খাঁচার তালা খোলা হ'ল। রমাবাই পৈশাচিক চীৎকারে জানালো আগে ঐ বড়টাকে খাঁচার মধ্যে ফেলে দিতে, বড়টাই দলের সর্দ্দার, পাজীর পা' ঝাড়া।

টেনী চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল; হাত ধরে টানতে

বড় বড় জলের ফোঁটা চোখ থেকে ঝরে পড়ে গেল। লব কুশ বেবী আর ঠিক থাকতে পারলো না। হাউমাউ করে কেঁদে চন্দ্ররাও-এর পায়ের উপর গিয়ে পড়লো।

—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও দিদিকে, এবারের মত মাফ কর,—একাজ আমরা আর কখনো করবো না।

চন্দ্ররাও কোন কথা বলে না, মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়।

বেবী ছিটকে গিয়ে রমাবাই-এর পা জড়িয়ে ধরলো, পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগলো—সে কি কান্না! পাষাণ গলে যায়, কিন্তু নিষ্ঠুর মানুষ অবিচল।

ট্রেলীকে খাঁচার দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে, এবার দরজা খুলে ভিতরে ঠেলে দিলেই হ'ল—একটি থাবাতে সিংহ শেষ করে দেবে।

চন্দ্ররাও আর চুপ করে থাকতে পারলো না। লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললো,—যাও ওদের সরিয়ে নিয়ে যাও চোখের সামনে থেকে এক্ষুণি।

রমাবাই বলে,—না কখখোনো না, দাও ভিতরে ঠেলে। না দিলে আমি এখুনি সার্কাস ছেড়ে চলে যাবো।

—যেতে হয় যাবে। ওদের সরিয়ে নিয়ে যাও।—একথা বলে চন্দ্ররাও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

রমাবাই মুখ গোঁজ করে বসে রইলো, রাগে সর্ব্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল।

বারো
আজব সহর কলিকাতা

সার্কাসের দলের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, সে এক ভয়ানক ব্যাপার। একটি সহরের সমস্ত মানুষ, জীবজন্তু সহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এমনি বোধ হয়। সারাদিন তোড়জোড়, ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করতে কেটে গেল। সন্ধ্যা থেকে মধুপুরের সমস্ত বাসিন্দা ভেঙ্গে এসে পড়লো ষ্টেশনে, সার্কাস-দলকে বিদায় দিতে।

প্রায় একটা পুরো ট্রেন লাগলো—মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, তাঁবু ও আসবাবপত্র নিয়ে। প্ল্যাটফরমে লোকেরা একবার এখানে একবার ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে ও আলোচনা করে।

টিপুকে টেনীদের কামরায় রাখা হ'ল। সাধারণ জন্তু ও নয়, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রচুর আছে, হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলবে না। এ ছাড়া গার্ড হিসাবে টিপুর প্রয়োজন আছে বৈ কি! কোথায় কোন্ ফাঁকে যদি আবার পালায় ছেলেমেয়েগুলো! সাবধানের মার নেই।

কলকাতায় আগে থেকে লোক পাঠানো হয়েছে সমস্ত ব্যবস্থা করবার জন্য। বৌবাজারের মোড়ে যে খোলা জায়গা আছে, সেখানে তাঁবু পড়বে। যেদিন পৌঁছানো, তার পরদিনই প্রথম শো। আগে থেকে ছবিওয়ালা প্ল্যাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিলে ছেয়ে ফেলা হয়েছে কলকাতা সহর। লোকেদের মুখে মুখে ফিরছে টেনী বেবীদের নাম, টিপুর কীর্ত্তি ও আম্বো-জাম্বোর পাগলামির কথা।

ট্রেন ছাড়তে প্ল্যাটফরম শুদ্ধ লোক রুমাল নেড়ে চেঁচিয়ে বিদায় জানালো। টেনীদের কামরায় টিপু বেঞ্চে বসে বসে লোকেরা যে সব ফুলের মালা দিয়েছিল, নিজের গলায় একবার পরছে আর খুলছে, মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে; ট্রেন যে ছাড়ছে, সে বিষয়ে ওর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

টেনী জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখলো মধুপুর ষ্টেশন ক্রমশঃ ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম আসার দিনটি বার বার মনে পড়লো, আরো মনে হ'ল শেখপুরা থেকে আসবার দিন—রাত্রে মালগাড়িতে বসে কিউলে মেলা দেখবার জন্য যে অভিনব যাত্রা। কোথায় কিউল আর কোথায় মধুপুর! ভাগ্যদেবী উপস্থিত আরো পূর্বদিকে ছুটে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কলিকাতা সহর—কেমন জায়গা, কে জানে?

খুব ভোরে হাওড়া ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। লোক নামা, প্রকাণ্ড ভারী ভারী জিনিষ নামানো, পশুদের হুঁসিয়ারে স্থানান্তরিত করা,—সে এক বিষম ঝঞ্ঝাট ও হাঙ্গামার কাজ। সমস্ত প্ল্যাট্‌ফরম কোলাহলে সরগরম হয়ে উঠলো। এত ভিড় ও এত গোলমাল যে চেঁচিয়ে কথা বললেও সব সময়ে শোনা যাচ্ছে না। এ-ত' ছোট ষ্টেশন নয়—হাওড়া ষ্টেশন। কত ট্রেন আসছে যাচ্ছে, তেমনি অগুণতি লোক,—মাথার ঠিক থাকে না।

চন্দ্ররাও দাঁড়িয়ে তদারক করছিল, হিসাব-পত্র করছিল। চাকরেরা হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে ছুটোছুটি করে। একজন চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল,—কর্ত্তা, ছেলেমেয়েরা নেই, পালিয়েছে।

চন্দ্ররাও ক্ষেপে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে,—টিপু ?

—টিপুও নেই।

চন্দ্ররাও কিছু বলতে পারলো না, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলতে লাগলো।

আজব সহর কলকাতা। লাইনবন্দী বাড়ির পর বাড়ি। রাস্তাঘাট একইভাবে ফুট্পাথ দিয়ে বাঁধা, ট্রামের লাইনে গাঁথা, মাথার উপর তারের জাল বোনা। এতটুকু ফাঁক নেই! সহরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘিরেছে, বেঁধেছে, ছোট করে দিয়েছে। বেড়াবার, একটু নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকা জায়গা পার্কগুলিও নিস্তার পায়নি। লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে ঘিরে খাঁচার মত বন্ধ করা হয়েছে। একটু আনমনা ভাবে রাস্তায় চলে কার সাধ্যি! ট্রাম, বাস, গাড়িঘোড়ার সবসময়ে সতর্ক সাবধানের চীৎকার,—সরে যাও, সরে যাও চট্পট্, নইলে আমাদের পায়ের তলায় পিষে মাড়িয়ে চলে যাব, প্রাণটুকু আর থাকবে না দেহে।

ফুটপাথে নিশ্চিন্ত হয়ে চলবে তার উপায়ও নেই। পিঁপড়ের সারির মত মানুষ, মানুষ, কত মানুষ—যাওয়া-আসা কচ্ছে ব্যস্তভাবে। একটু অন্য দিকে চেয়েছ ত' গোঁজা মেরে ধাক্কা মেরে চলে যাবে। যাবার সময় বলে যাবে,—দেখতে পাও না চোখে, কাণা নাকি ? —পিঁপড়ের সারির মত হলে কি হয়, পিঁপড়েদের চেয়ে অনেক বেশী অভদ্র। পিঁপড়েরা যখন চলাফেরা করে, ধাক্কা মারতে দেখেছ ? 'কাণা নাকি' বলতে শুনেছ ?

এই যে এত মানুষ দৌড়ে ছুটোছুটি করছে, এদের মুখ দেখে মনে হয় শুধু এই ব্যস্তভাবে দৌড়ে যাওয়া-আসাই এদের কাজ। কোথায় যাচ্ছে, কি জন্য যাচ্ছে, এরা জানে না কিচ্ছু ; পৃথিবীর কোন জিনিষে এদের কৌতূহল নেই। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে যাবে এক মিনিটে। তুমি হঠাৎ পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকো। দলে দলে লোক ভিড় করে আসবে তোমার চারপাশে, তোমার মতনই আকাশে মুখ তুলে ভীষণ গম্ভীর হয়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে কোথায় আছে দ্রষ্টব্য জিনিষ ! না দেখতে পেলে লজ্জার মাথা খেয়ে কৌতূহলের তাড়ায় বেমালুম প্রশ্ন করে তোমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে,—কি দেখছো ভাই, বল না সত্যি বল না !—ওদের অত ব্যস্তভাবে যাওয়া আসা ভুলে গেছে, এখন আকাশে একটা কিছু দেখতে পাওয়ার উপর নির্ভর করছে সমস্ত জীবন !

এমনি সহর কলকাতা ! কোথায় কি হচ্ছে, কেউ খবর রাখে না ; খবর পাবার চেষ্টাও করে না। কিন্তু যেখানেই একটা কিছু হোক—তা সে যত সামান্য যত তুচ্ছই হোক—দর্শকের অভাব হবে না, সারাদিন ধরে এবং রাতের অনেকটা অংশ পর্য্যন্ত।

বৌবাজারের মোড়ে সেই খালি জায়গার সামনে দেখা গেল, সারাদিন একদল মানুষ দাঁড়িয়ে। একই লোক যে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তা নয় ; কেউ যাচ্ছে কেউ আসছে, কিন্তু দলটি মোটের উপর ঠিক মোতায়েন আছে।

মাঝখানে প্রকাণ্ড বড় তাঁবু পড়লো। পিছনে ঘিরে ঘিরে ছোট ছোট তাঁবু লাগানো হ'ল। জন্তুদের বড় বড় গাড়ি, খাঁচা পাশাপাশি

সাজিয়ে রাখা হ'ল চিড়িয়াখানার মত। একধারে সারি সারি হাতী, উট, ঘোড়া, সব বাঁধা হ'ল। সকলে বড় ব্যস্ত। কাল সন্ধ্যায় প্রথম খেলা দেখাতে হবে।

চন্দ্ররাও মুখ কালো করে দেখাশুনা তদ্বির করে বেড়াচ্ছে। ওর উৎসাহ ও আনন্দ যেন অনেকটা উপে গেছে। কোন রকমে শরীরকে টেনে টেনে কাজ চালাচ্ছে। চার চারটা ছেলেমেয়ে ষ্টেশন থেকে উধাও হয়ে সরে পড়লো, সঙ্গে গেল অমন সাধের শেখানো পড়ানো গরিলা! এদিকে রমাবাই দারুণ জ্বরে শয্যাশায়ী। সেই তর্কাতর্কির পর থেকে রমাবাই খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করেছিল। ট্রেন থেকে জ্বর হয়ে গেল। বোধহয় রাগের আগুন ফুটে বেরুতে না পেরে সারাদেহ জ্বরে পুড়িয়ে মারছে।

এদের সব খেলা দেখাবে কে? নতুন আনা অন্য লোকদের দিয়ে সার্কাসের কসরৎ দেখানো যায় না। অনেক কষ্ট, অনেক সাধনা করে শিখতে হয়। দু'ঘন্টা দেখে হাততালি দিয়ে যারা ঘরে ফিরে গেল, তারা ভেবেও দেখে না কত পরিশ্রম করে এরা শিখেছে, কত কষ্ট করে এরা দেখাচ্ছে!

এখন উপায় কি? খবরের কাগজে, প্ল্যাকার্ডে, হ্যাণ্ডবিলে, সাতদিন আগে লোকেরা জানে কি কি হবে! আসছে কাল সন্ধ্যায় প্রথম 'শো'। মানুষ সব ক্ষেপে যাবে দেখতে না পেলে! ভেঙ্গে-চুরে লণ্ডভণ্ড করে দেবে! তাঁবুতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে! হিংস্র পশুদের ছেড়ে দেবে খাঁচা খুলে!

সহরের মানুষ ক্ষেপে গেলে বড় ভয়ানক, তাদের সামলানো দায়।

তখন ?—চন্দ্ররাও-এর এতদিনের খ্যাতি, এত কষ্টের সুনাম ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি যাবে।

সত্যি চন্দ্ররাও-এর বড় দুর্দ্দিন। সার্কাস এবার বুঝি উঠে যায়! এদিকে আয়োজন চলেছে কোন নিয়তির নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে। লোক পাঠানো হয়েছে—চারিদিকে খোঁজ, ভাল করে খোঁজ সেই চারটি ছেলেমেয়েকে, সেই সাধের গরিলাকে।

কিন্তু খোঁজা কি সাধারণ ব্যাপার? সহরের ভিড়ে নিজেরাই দিনে দশবার হারিয়ে যেতে হয়, এর মধ্যে অন্যকে খুঁজে বার করা সহজ কাজ নয়। পুলিসে খবর? অসম্ভব। পুলিসে খবর দিলে নিজের জালে নিজেকে পড়তে হবে। চন্দ্ররাওকে সার্কাস ছেড়ে জেলের মধ্যে পচে মরতে হবে। ছোট ছেলেমেয়েদের আটকে রেখেছে কেন?—এতদিন?

আম্বো-জাম্বো—মুখ দেখে মনে হয় ওরা খুশী। যাক্ এবার বাচ্চারা মুক্তি পেল, আগের বারে বড্ড ধরা পড়েছিল।

দিন গড়িয়ে রাত্রি এল। চন্দ্ররাও-এর দুঃখের রাত্রি কেটে পরের দিন এসে উপস্থিত।

খোঁজ পাওয়া গেল কিছু?—না, একেবারে কিচ্ছু না! লোকের পর লোক ফিরে এসে জানায়,—দেখতে পেলাম না। কতলোককে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কেউ কিছু বলতে পারলো না।

কোথায় গেল তারা? কোথায় গেল টিপু? রাস্তায় গাড়ি-চাপা পড়ে গেল না ত'?

রমাবাই-এর জ্বর ছেড়েছে কিন্তু এত দুর্ব্বল যে আজকের সন্ধ্যায়

বাঘ সিংহ নিয়ে খেলানো অসম্ভব। নিজের শরীরের উপর জোর নেই, হিংস্র পশুদের উপর জোর খাটাবে কি করে? আজ অসম্ভব,—কাল দেখা যাবে।

দিন গড়িয়ে গেল। ঢং ঢং করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো। বিকাল পাঁচটা। চন্দ্ররাও নিজের তাঁবুতে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে। হাতঘড়ি চোখের সামনে এনে দেখলো, হ্যাঁ পাঁচটাই বটে, আর এক ঘণ্টা বাদে 'শো' দেখাতে হবে। সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। দু'চারজন করে লোকজন আসতে সুরু করেছে। ঐ গেটের সামনে মঞ্চের উপর ব্যাণ্ড বাজতে আরম্ভ হ'ল।

এবার দলে দলে লোকেরা আসবে সার্কাস দেখতে, আত্মীয়-পরিবার ছেলেপুলে নিয়ে হাসতে হাসতে গল্প-গুজব করতে করতে। আগে থেকে সব পড়েশুনে আসবে—কি কি হবে, কে কে আছে! ক'টা জন্তু-জানোয়ার, তাও তাদের মুখস্থ। এদিকে পূরাদমে আয়োজন চলেছে সবুজ পর্দ্দার পিছনে।

কার পর কি সাজানো হবে, কোন্ কোন্ ঘোড়া প্রথমে যাবে, খেলার কতক্ষণ আগে বাঘ সিংহকে আফিং দেওয়া হবে,—রোজকার মত ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হচ্ছে। রজনীকান্ত আজ চন্দ্ররাও-এর বদলে দেখাশুনা করতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু তারা কই? সেই চারটি প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছেলেমেয়ে, সেই সাধের শেখানো গরিলা? তাদের খেলার সময় হ'লে, কে গিয়ে নামবে, কে দেখাবে খেলা?—দর্শকরা বলবে কি? বাঘ সিংহের খেলাই বা দেখায় কে?

চন্দ্ররাও আর ভাবতে পারে না। মাথা খারাপ হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে এবার! এ যন্ত্রণাদায়ক ভাবনা থেকে উদ্ধার নেই। দু'হাতে মুখ ঢেকে চন্দ্ররাও গোঙাতে লাগলো, ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলো,—ভগবান্ এর থেকে, এত কষ্ট থেকে আমাকে পরিত্রাণ দাও!

তেরো
চারটি ছেলেমেয়ে ও গরিলা

টেনীরা ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফরমে দাঁড়ালো। দেখলো চারিদিকে ভিড়ে ভিড়। টেনীর মনে পড়লো, বাবা বলতেন,—বড় হলে যখন কলকাতায় মামার বাড়িতে নিয়ে যাবো, দেখবে কত মানুষ একসঙ্গে পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে! যেখানেই যাও শুধু মানুষের ভিড়। বাবা ঠিকই বলতেন বটে!

টিপুও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বেচারী একেবারে হকচকিয়ে গেছে। এত মানুষ, এত গোলমাল, কখনো জীবনে দেখেনি। টিপু এই প্রথম কলকাতায় এল। ভ্যাবাচাকা খেয়ে, ভয় পেয়ে টেনীদের গা' ঘেঁসে দাঁড়ায়, হাজার হোক এরা অনেক চেনা। একসঙ্গে থেকেছে, একসঙ্গে খেলা দেখিয়েছে; ঐ ব্যস্তভাবে চেঁচামেচি করে যারা দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে ওদের চেয়ে টিপুর কাছে টেনীরা অনেক আপনার।

টেনী আপন মনে বলে উঠে,—কই কেউ আসছে না কেন? সকলে বোধ হয় মাল ও জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ব্যস্ত আছে।

লোকের ভিড়ের ফাঁক দিয়ে একবার দেখা গেল চন্দ্ররাওকে, একবার রজনীকান্তকে, পিছনে মালগাড়ির সারির কাছে অনেক লোকের মধ্যে ব্যস্ত।

লব হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠে,—দিদি, চল এই বেলা পালাই, ওরা এসে পড়ার আগে—এই মস্ত সুযোগ।

—কোথায় যাবে, মামার বাড়ি ? কিন্তু ঠিকানা ?

—সে ঠিক হবে। মামাবাবুর নাম কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গিয়ে বললে লোকে নিশ্চয় বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

কথাটি মনে লাগে টেনীর। কুশ ও বেবী উৎসাহে রাজী হয়ে যায়। আর সার্কাস ভাল লাগে না এমন বন্দী অবস্থায়, বাড়ি না ফিরার মনঃকষ্ট নিয়ে। চন্দ্ররাও যে মানুষ, কোনদিনই ছাড়বে না। শেষে আম্বো-জাম্বোর মত সারা জীবন শুধু সার্কাসে কাটাতে হবে।

টেনী বললো,—চল !

যা বলা তাই করা সেই মুহূর্ত্তে ! সময় নষ্ট করা যায় না, পিছু ফিরে তাকালেই হয়তো আবার গ্রেপ্তার।

টেনী বেবীর হাত নিজের হাতে শক্ত করে ধরে পা' বাড়ালো। লব-কুশ জোরে জোরে পা' চালিয়ে সঙ্গে রইলো। উত্তেজনায় দম আটকে যাবার মত। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে পাশ কাটিয়ে সোজা গেটে গিয়ে পৌঁছালো। টিকিট-চেকার দাঁড়িয়েছিল ; জানতো সার্কাস-পার্টি আসছে। এদের দেখে বুঝলো এরা সার্কাসের দলের, টিকিট নিয়মমত পরে ম্যানেজার এসে দেবে। কিছু না বলে দরজা ছেড়ে দিল। আরেকটি কারণে চেকার বুঝেছিল নিশ্চয়ই এরা সার্কাসের লোক, সেটি টেনীরা পরে আবিষ্কার করলো।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে সকলে চমকে সভয়ে দেখলো, পাশে দাঁড়িয়ে টিপু !—টিপু ধরে নিয়ে যেতে এল নাকি ? সার্কাসের ঐ গোয়েন্দা পুলিশ !—না, তা নয়। টিপু বেচারী বড় ঘাবড়েছে নিজে সহরের এই গোলমাল, কাণ্ডকারখানা দেখে। টেনীদের পালাতে

দেখে ভাবলো সঙ্গ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কোথায় থাকবে এই একলা অজানা অচেনাদের মধ্যে ?

রাস্তায় এসে মোটারের অবিশ্রান্ত হর্ণ ও ট্রামের ঘড়ঘড় শুনে টিপু আরো ঘাবড়ে এদের গায়ের উপর এসে দাঁড়ালো। গোয়েন্দা পুলিশের দাঁত খিঁচানো হাসি আর নেই, চোখে মুখে আশ্রয়প্রার্থীর করুণা ভিক্ষা ফুটে উঠলো।

কুশ বলে,—নিয়ে চল দিদি—যখন এসে পড়েছে। ফিরিয়ে দিতে গেলে আমরাও ধরা পড়ে যাবো।

টেনী ভাবলো একটু, সঙ্গে নেবে কিনা। কিন্তু ভাবনা-চিন্তার সময় কোথা ? যখন পালিয়েছে তখন ধরা এবারে কিছুতেই পড়া হবে না। বললো,—টিপু, এস।

এক হাতে বেবীর, অন্য হাতে টিপুর হাত ধরে টেনী এগুতে থাকলো। লব-কুশ সঙ্গে সঙ্গে চললো।

টেনী অনেকবার শুনেছে যে হাওড়া ষ্টেশন থেকে গঙ্গার পুল পেরিয়ে কলকাতা যেতে হয়। দেখতে পেল প্রকাণ্ড পুল রাস্তা থেকে। ভাবলো, ওদিকে যাওয়া হবে না আজকে ; চন্দ্ররাও ধরে ফেলবে। যখন বেরিয়েছে, এবারে সত্যি পালাতে হবে। উল্টো দিকের পথ ধরলো।

লব-কুশ খুব খুশী। এই লুকোচুরি খেলায় মজা আছে। ওদের সবাইকার ভয়-ভাবনা খুব কমে গেছে, শেখপুরা থেকে চলে আসার পর থেকে। ভয় না করলেই ভয় থাকে না। যা হবার তা হবেই, ভেবে কি লাভ ? বেবী পর্য্যন্ত আজকাল ভয় পায় কম। 'আমি ত'

ভয় পাই না'—বলা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। এই যে এদের সঙ্গে একটি পয়সাও নেই, সেজন্য কোন দুর্ভাবনাও নেই। পালাতে হবে চল পালাই, পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

বিপরীত দিকে চলতে চলতে দেখে পথ ক্রমশঃ উপরে উঠে যাচ্ছে। আরে, এও যে আরেকটি ব্রিজ! উপরে উঠে পাঁচিল দিয়ে ঝুঁকে দেখে, নদী নেই—শুধু রেলের লাইনের জাল বোনা।

কুশ বলে,—এ ত' ভারী মজা! নীচে নদী নেই অথচ পুল রয়েছে! কি বোকা, মিছামিছি কত বড় পুল বানিয়েছে, কত খরচ করে।

—না গো মশাই! অত লাইন দেখছো না, কত ট্রেন আসা-যাওয়া কচ্ছে! রাস্তা ঐখান দিয়ে হলে সব সময়েই রাস্তা বন্ধ রাখতে হ'ত, তখন লোকজন গাড়ি-ঘোড়া যেত কি করে শুনি?—লব বলে।

টেনী বললো,—ঠিক তাই, লবের বুদ্ধি আছে মানতে হবে।

—আর সার্কাস দেখবার বুদ্ধিটি? কে দিল? দিদি, তুমি বড় একচোখো, খালি লবের গুণ দেখতে পাও।—কুশ রেগে উত্তর দেয়।

পথ চলতে চলতে কতদূর এসে পড়েছে! লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। এ কি রে বাবা, চারটি ছেলেমেয়ে ও একটি প্রকাণ্ড গরিলা! পুষেছে বোধ হয়। একি অদ্ভুত পোষার সখ!

কেউ কেউ সঙ্গ নেয় বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা।

টিপু মাঝে মাঝে ফিরে দাঁড়ায়, দাঁত খিঁচিয়ে হাসে, সব ভয়ে 'বাবারে মারে' করে লম্বা দৌড় দেয়।

টিপুর ফূর্ত্তি খুব, মুক্তির আনন্দ ভোগ করছে। বাঁধা-নিষেধ নেই, এদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলতে পাচ্ছে, চারিদিকে কত কি দেখতে পাচ্ছে! সার্কাসে একটু চোখের আড়াল হ'লেই,—টিপু এদিকে আয়, ঐখানে বোস,—অষ্টপ্রহর লেগে আছে।

ভিড় কম দেখে টিপুর সাহস হয়েছে, টেনীর হাত ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। একটি মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বসে খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া হ'ল। প্ল্যান ঠিক হ'ল। আজকের দিনটি কোন-রকমে লুকিয়ে থাকতে হবে, কাল সকালে খোঁজ করে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মামার বাড়ি গিয়ে উঠা যাবে। চন্দ্ররাও যা খোঁজাখুজি করবার আজকে করে হাল ছেড়ে দেবে।

—আরও একটি কথা—কারুকে বলা হবে না, শেখপুরা থেকে এসেছি, ও কিভাবে পালিয়েছি। তাহলে আবার অন্য কেউ চন্দ্ররাওএর মত ধরে নিয়ে আটকে রাখবে।

বেবী বললো,—খিদে পেয়েছে দিদি!

টিপু এতক্ষণ দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করে গাছের পাখী তাড়াচ্ছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে ধপ্ করে কাছে এসে বসে পেটে হাত দিয়ে দেখালো—বেজায় খিদে।

ও ঠিক বুঝে নিয়েছে টেনীকে জানাতে হবে, জানালেই পাওয়া যাবে। কিন্তু খাবার পাওয়া যায় কোথা? পয়সা একটিও নেই কাছে। কারুর বাড়ি গিয়ে চাওয়া যাবে? যদি না দেয়? দেখা যাক্ ত' চেষ্টা করে! তেষ্টাতেও গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সূর্য্যদেব যে ঠিক মাথার উপরে।

আবার অভিযান সুরু হয়। এবার খাবারের সন্ধানে। একটি ছোট দোতালা বাড়ি, বাইরের রোয়াকে বসে একজন লোক ছোট মেয়ে কোলে নিয়ে। এদের আসতে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠে,—যাও যাও আমরা বাঁদর নাচ দেখতে চাই না, যত সব বুজরুকি!

টেনী কাছে এসে বল্লে—বড় খিদে পেয়েছে, যদি খেতে দেন কিছু।

—খেতে? এটা কি ধর্ম্মশালা পেয়েছ? যাও, যারা নাচ দেখবে, তারা খেতে দেবে; যাও, যাও।

টিপু হাবভাবে বুঝলো খাবার দিতে রাজী হচ্ছে না। ভাবলো তারও একটু মিনতি করে আবেদন জানানো দরকার। কিন্তু গরিলার কথা যে মানুষ বোঝে না, সে জ্ঞান এখনো হয়নি।

টিপু কাছে গিয়ে খপ্ করে লোকটির হাত ধরে অন্য হাত নিজের পেটে রেখে গরিলার ভাষায় কতকগুলি শব্দ করে কি বলতে গেল।

—আরে বাপরে মেরে ফেললে রে—এরা সব ডাকাত, লুটেরা,—বলে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে ভদ্রলোক হেঁচকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল। ছোট মেয়েটিকে তুলে নিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় ভিতরে, দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিল।

সকলে হিহি হোহো করে হেসে গড়িয়ে যেতে লাগলো। এরকম দারুণ মজার দৃশ্য দেখে খিদে তেস্টা ভুলে গেছে! কি রকম মুখ করলো লোকটি!

টেনী বলে,—চল পালাই। চেঁচিয়ে লোকজন জড় করবে; শেষে খাবার পাওয়া দূরের কথা, মুস্কিলে পড়তে হবে।

আবার চলতে থাকলো। একটি মাত্র চিন্তা খাবার কি করে পাওয়া যায় !

খানিকটা এসে দেখা গেল দূরে সাইনবোর্ডে লেখা,—"বিপিন পবিত্র ভোজনালয়"।

টেনী বললো,—তোমরা একটু দাঁড়াও এপাশে, আমি একলা গিয়ে কথা বলি যদি কিছু খেতে দেয়। টিপুকে দেখে ভয় পেতে পারে।

এরা একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। টেনী এগিয়ে হোটেলের সামনে গিয়ে দেখলো, চেয়ারে একটি লোক বসে আছে।

বললো—আমাদের কিছু খেতে দেবেন ? বড্ড খিদে পেয়েছে।

—নিশ্চয়ই দেবো।

বলে কি ? এক কথায় রাজী !

—আমাদের পয়সা নেই কিন্তু, শুধু শুধু খেতে দিতে হবে।

—শুধু কেন তোমার বাঁদর নাচ দেখাও, খাওয়াবো। আমি বাঁদর-নাচ দেখতে বড় ভালবাসি।

—আমি ত' জানি না !

—দেখ বাপু মিছে কথা ব'ল না এই দিনের বেলায়। আমি সহুরে-লোক, অত সহজে চোখে ধূলো দিতে পারবে না। তোমাদের আসতে দেখেছি। চারজন ছেলেমেয়ে ও একটি প্রকাণ্ড কালো বাঁদর। ওদের ওদিকে রেখে তুমি একলা এলে।

—বাঁদর নয় গরিলা।

—তাহ'লে ত' আরো মজা। গরিলার নাচ কখনো দেখিনি। ভাল করে দেখাও ; পেট ভরে খেতে দেবো সকলকে।

টেনী একটু চুপ করে ভাবলো। চোখ পড়লো একটা লম্বা সাইনবোর্ডে লেখা—ভাত—দু'পয়সা

ডাল—এক পয়সা

মাছের ঝোল—এক পয়সা—ইত্যাদি।

জিভে জল এসে গেল। এতক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি; সেই সকাল থেকে ট্রেনের পর খালি হাঁটা আর হাঁটা। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। একটু খেলা দেখালে ক্ষতি কি?

টেনী ঘাড় নেড়ে জানালো, আচ্ছা। হাত দিয়ে ইশারা করে ওদের কাছে ডাকলো।

খবর পেয়ে হোটেলের সব লোক এসে হাজির। রাস্তার লোক-জনও ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো। ভারী মজা! গরিলার খেলা ত' চাড্ডিখানি কথা নয়,—গরিলা ক'জন দেখেছে শুনি!

টেনী গম্ভীর ভাবে সার্কাসের যে সব খেলা দেখানো সম্ভব, দেখাতে লাগলো। লব কুশ বেবী সাহায্য করতে লাগলো।

টিপু প্রথমে আপত্তি জানায়। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, এখন খেলা দেখানো চলবে না।

টেনী পিঠে হাত বুলিয়ে, নানা ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দেয় যে, খেলা না দেখালে অন্ন জুটবে না, আর দেখালে পেট ভরে এত খাওয়া যাবে যে পেট জালার মত ফুলে উঠবে। শেষে গরিলা টিপু ভাল-মানুষটির মত টেনীর হুকুম ও ইশারাতে খেলা দেখাতে লাগলো।

কত মজার খেলা! লোকেরা হেসে খুন!

—বাহাদুর মেয়ে বটে, এতটুকু বয়সে একটা বুনো গরিলাকে শুধু

যে পোষ মানিয়েছে তা নয়, কত রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলা শিখিয়েছে! বড় হ'লে নিশ্চয় কেওকেটা হয়ে যাবে! হাজার হোক বাঙ্গালীর মেয়ে কিনা, মাথায় বুদ্ধি আছে।—দর্শকরা এমনি আরো কত মন্তব্য করে!

টিপু দু'হাতে ভর দিয়ে চললো। এক পায়ে খুঁড়িয়ে চললো। বেবীকে দু'হাতে ছুঁড়ে লুফে নিল। লব-কুশকে কাঁধে করে বন বন ঘুরলো। মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে ধপাস্‌ করে পড়ে ধূলোয় গড়াগড়ি দিল। এক দোই তেন সার পাঁইচ্‌—গুণে গেল। আরো কত কি! খেলার নেশায় একটির পর একটি চলতে থাকলো। খেলোয়াড় ও দর্শক কারুরই হুঁশ নেই, কত সময় কেটে গেছে!

পরে খেলা শেষ হতে হোটেলের মালিক প্রচুর খাওয়ালো যত্ন করে। বিদায় দেবার সময় বার বার বললো,—এমন খেলা জীবনে দেখিনি। যদি এপথে আবার আস, নিশ্চয় এস আমার হোটেলে। পেট ভরে যত ইচ্ছা খেও।

বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসেছে। আকাশ রামধনু রংএর। পাতলা মেঘে ঢাকা সূর্য্য ফুলঝুরির মত চারিদিকে কিরণ-রেখা ছড়িয়েছে। পাখীরা গাছের মাথায় মাথায় ঘুরে ঘুরে ডাকছে। লোকেরা কাজের শেষে বাড়ি ফিরছে।

সোজা রাস্তায় চলতে চলতে এক প্রকাণ্ড বাগানের সামনে এসে টেনীরা পৌঁছালো।

উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'বোটানিক্যাল গার্ডেনস্‌'। ওঃ

এখানে কলকাতার লোকেরা বেড়াতে, পিক্‌নিক্ করতে আসে ছুটির দিন—শুনেছে বটে !

ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। একজন মালী বসে গাছের গোড়া কোপাচ্ছিল, ফিরে তাকালো। টিপুকে সঙ্গে দেখে বললো,—তোমরা এত দেরী করে এসেছ কেন ? সন্ধ্যা হলেই চলে যেতে হবে। এখানের এই নিয়ম।

কুশ এগিয়ে গিয়ে বলে,—নিয়ম কেন এরকম ?

—নিয়ম মানে নিয়ম, তার বেশী জানি না। আবার ঐ জংলী জন্তুটাকে সঙ্গে এনেছ কেন ? গাছপালা ভেঙ্গে ছিঁড়ে একাকার করে দেবে। যাও, বরং কাল সকালে এস ; আর ওকে সঙ্গে এনো না।

কুশ রেগে উত্তর দেয়,—ও জন্তু হ'লেও জন্তু নয়, অনেক মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধি আছে। আমরা বারণ করলে তোমার গাছপালায় হাত দেবে না।

টেনী ভাবছিল আজ রাতে কোথায় থাকা যায় ! বললো,—এখানে রাতে থাকা যায় না ?

মালী যেন হঠাৎ ক্ষেপে গেল ;—ও রাত কাটাতে এসেছ সরকারী বাগানে ? নিয়ম জান না—চালাকি ? যাও, যাও এখনি বেরিয়ে যাও ; সিপাই ডাকবো না হ'লে।

ভয় দেখানোতে নড়ে না দেখে মালী হাতের কুরপী উঁচু করে তেড়ে এল। মনে হ'ল এবার দেরী করলে নিশ্চয় মারবে।

টিপু পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিল ব্যাপার

কি! মালীকে দোড়ে আসতে দেখে এক লাফে কাছে গিয়ে গিট-বাঁধা টিকি ধরে—হেঁইও টান। মালী 'বাপরে' বলে চিৎপটাং!

"টিপু, টিপু!"—চেঁচিয়ে উঠলো সকলে।

তবু শোনে না কথা। টান সমানেই চলেছে, এবার মাথার খুলি বুঝি খুলে আসে!

টেনী লব কুশ টানাটানি করে কোন রকমে ছাড়ালো, টেনী ত' চটাস্ করে পিঠে এক চাপড়ও মেরে দিল। তবু লজ্জা আছে ওর? দাঁত খিঁচিয়ে সমানে হাসছে। আর হাসছে বেবী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর মাঝে মাঝে অনুকরণ করে—'বাপরে'!

টিপু ও বেবীর হাত ধরে টানতে টানতে সকলে দৌড়তে লাগলো বাগানের ভিতর—মালী তখন মাথায় হাত বুলাচ্ছে।

খানিকটা গিয়ে চোখে পড়ে—গঙ্গা তরতর করে বয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর গঙ্গা! কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখবার ও উপভোগ করবার সময় নেই, হয়তো মালী লোকজন সিপাই নিয়ে পিছু নিয়েছে। আরো দৌড়ে যেতে হয়।

সামনে পড়ে একটি বড় ঘরের মত,—আগাগোড়া গাছপালা দিয়ে তৈরি। ভিতরে উঁকি মেরে দেখে নানারকমের গাছ টবে টবে থাক থাক যত্ন করে সাজানো। সে যে কত, গুণে ঠাহর করা যায় না। মাঝখানে একটি ছোট ফোয়ারা দিয়ে জল ঝরছে।

এই বেশ জায়গা। লুকিয়ে থাকা যাবে আর শীতের রাতটি মন্দ কাটবে না।

তাড়াতাড়ি সকলে ঢুকে পড়লো, আর একটি লুকানো জায়গা বেছে

নিয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগলো মালী আসছে কিনা! মালী আর এল না। বোধহয় সাহস হ'ল না। টিকির অর্দ্ধেকটি ত' গেছে, এবারে যদি হাত পা' একটা ছিঁড়ে যায়!

ক্রমশঃ রাত্রির অন্ধকার চারিপাশে ছেয়ে গেল। গাছপালা আর দেখতে পাওয়া যায় না। জোনাকীরা পিটির পিটির আলো জ্বেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো শূন্যে।

টিপু পেটে হাত দিয়ে দেখালো খিদে পেয়েছে আবার। খিদে ত' পাবেই, সকলেরই পেয়েছে। শেখপুরায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পেত, মধুপুরে নিয়মবাঁধা সার্কাসের আইনেও চারবার খেতে পাওয়া যেত, আর আজকে মোটে একবার জুটেছে।

টেনী দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে জানালো কিচ্ছু নেই খাবার, বাইরে হাত দেখিয়ে বললো—এত রাত—অন্ধকার গিয়ে আনবে কে?

লব বলে,—চল না দিদি, গিয়ে দেখি মেলে কিনা!

লব-কুশের আজকাল ভারি সাহস। লব-কুশ কি, বেবীও তৈরী বাইরে যেতে, একবার বললো না—ভয় পাই না আমি। কত বদলে গেছে সব!

টিপু উঠে দাঁড়ালো। ইশারা করে বললো—তোমরা থাকো, আমি আসছি।

লব-কুশ সঙ্গে যেতে চায়। হাত দিয়ে ঠেলে বারণ করে অন্ধকারে চোরের মত বেরিয়ে গেল। বনের পশু বনে গেল একলা, —ফিরবে ত'?

খানিক বাদে সকলে চমকে উঠলো একটা কালো ছায়া একেবারে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে।

ওঃ ভয় নেই, টিপু ফিরে এসেছে।

ধপ্ করে একটা কি পায়ের কাছে ফেলে দিল। টেনী হাত বুলিয়ে অন্ধকারে অনুভব করে দেখে, কলার কাঁদি—অনেকগুলি কলা আছে—বেশ বড় বড়। গরিলা কিনা, গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক কলার কাঁদি গাছ থেকে পেড়ে এনেছে।

যাই হোক—যা পাওয়া গেছে, তাই ভাল। পেট ভরা নিয়ে কথা। সকলে দু'তিনটা করে পেটের জ্বালায় খেল। ফোয়ারা থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বাকী কলা এক পাশে সরিয়ে রেখে টেনী যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে টিপুকে বললো—এগুলি খেয়ে ফেল না, কাল সকালে খেয়ে বেরুনো হবে।

সকলে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে বেবী বলে,—দেখ দিদি, টিপুকে সেখপুরায় নিয়ে গিয়ে আমরা একটা নূতন সার্কাস খুলবো। আজ যা খেলা দেখিয়েছে, ওর সঙ্গে আমরা যদি দু'একটা করে দেখাই ত' বেশ দেখানো যাবে।

লব-কুশ প্রবল উৎসাহে আরো খুঁটিনাটি আলোচনা করতে লাগলো। ঘড় ঘড় মেঘ ডাকার মত শব্দে জানা গেল, টিপু ঘুমিয়ে পড়েছে। এরাও এক এক করে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো অনেক বেলা হয়ে গেছে। রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে। গাছপালার তৈরী ঘরের ভিতর শুয়ে বুঝতে পারা

যায়নি এত বেলা হয়ে গেছে। উঠে পড়ে তৈরী হয়ে নেওয়া গেল, মামার বাড়ি তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। খুঁজতে ত' খানিকটা দেরী হবেই।

টিপু গাছের টবে ঠেসান দিয়ে পা' ছড়িয়ে বসেছিল। টেনী বলে,—চল টিপু, বেরিয়ে পড়া যাক্। কতটা হাঁটতে হবে কে জানে? কলাগুলি খেয়ে বেরুনো যাবে। কিন্তু কোথায় কলা?

একটি খোসা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না। টিপুর দিকে চাইতে, দাঁত খিঁচিয়ে চোখ নীচু করে হাসে—লজ্জার হাসি।

—ও বুঝেছি, ভোর না হতেই 'পেটায় নমঃ' করে দিয়েছে!

রাগ করবে কি, সকলে হেসে অস্থির, টিপু শয়তানের কাণ্ড দেখে।

—চল দেখা যাক পথে কি মেলে! মামার বাড়ি পৌঁছে গেলে পেটভরা খাওয়া আছেই।

সকলে বেরিয়ে পড়লো। গেটের কাছে আসতেই কালকের সেই মালীর সঙ্গে দেখা, গাছে জল দিচ্ছে। মালী এদের দেখেই জলের ঝারি ফেলে দৌড়! বেচারী কালকের কথা ভুলতে পারেনি। ভালই হ'ল, কোন হাঙ্গামা বাঁধলো না।

পথ চলতে চলতে বেবী বললো,—দিদি, চল কালকের হোটেলে যাওয়া যাক। একটু খেলা দেখিয়ে কিছু খেয়ে মামার বাড়ি খোঁজা যাবে।

কথাটি মন্দ নয়। কিন্তু অনেক ঘুরেও কালকের হোটেল পাওয়া গেল না। এত রাস্তা কি মনে থাকে? অদৃষ্টে আজ খাওয়া নেই সকালে।

কিছু দূর যেতে পিছন থেকে একটি লরী ঝড় ঝড় শব্দে তেড়ে এল। এরা রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়ালো। লরী একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালো।

যে চালাচ্ছিল সে ঝুঁকে বললো,—কোথায় যাবে তোমরা ? আমার রাস্তায় যাও ত' পৌঁছে দিতে পারি।

—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে যাবো।

—এখান থেকে অনেক দূর যে হেঁটে যেতে সারাদিন লেগে যাবে। আমি টালায় যাচ্ছি শ্যামবাজারের মোড়ে নামিয়ে দিতে পারি।

—শ্যামবাজারের মোড় আবার কোথায় ?

—সেখান থেকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট আরম্ভ।

সেই ভাল সুবিধা হ'ল, হাঁটতে হবে না। লরীতে চটের বস্তা বোঝাই ছিল। তার উপরে সকলে গিয়ে বসলো। লরীর লোকটি যেতে যেতে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো ঘাড় ফিরিয়ে। হ্যাঁ না করে অতি কষ্টে রেহাই পাওয়া গেল।

না, আর সত্যি কথা বলা হবে না, মামার বাড়ি না পৌঁছানো পর্য্যন্ত হুঁসিয়ার হতে হবে। চন্দ্ররাওএর মত আরেকজনের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই।

শ্যামবাজারের মোড়ে নামিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে লরীওয়ালা চলে গেল।

কলকাতা সহরের মানুষরা সবিস্ময়ে দেখে প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায় চারটি ছেলেমেয়ে ও একটি গরিলা! একি অসম্ভব কাণ্ড!

কতলোক গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে—কি কর, কোথায় যাবে। —একটি দল সঙ্গে সঙ্গে পিছনে চলে।

কত লোককে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—রজনীবাবুর বাড়ি জানেন? কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে থাকেন?

সকলেই পালটে জিজ্ঞাসা করে,—কত নম্বর? নম্বর জানা নেই? তাহলে সারা বছর খুঁজে বেড়ালেও পাবে না। এ কি পাড়াগাঁ যে নাম বললেই লোকে বলে দেবে ঐ বাড়ি?

সত্যি কথা। খেয়াল হয়নি এমনি মুস্কিলে পড়তে হবে। সারিবন্দী বাড়ির পর বাড়ি, কত বড় বড় বাড়ি, এর মধ্যে কোথায় মামাবাবু লুকিয়ে আছেন বলা মুস্কিলের ব্যাপার। তা হলেও যখন বেরুনো গেছে, চেস্টা করতে হবে। নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। হয়তো হঠাৎ মামাবাবুর সঙ্গে সামনাসামনি হয়ে যাবে।

পথ চলতে চলতে দু'ধারে জিজ্ঞাসা করতে করতে চললো। পিছনে লোকেরা মন্তব্য করতে করতে চলে—এরা খেলা দেখাবে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও; বাড়ি খুঁজছে ঐ জন্য। চল যাওয়া যাক সঙ্গে, গরিলার নাচ দেখবার জিনিষ।

কতবার টেনীকে বলে,—দেখাও না খেলা!

কিন্তু সেদিকে টেনীর হুঁশ নেই। আজ মামার বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে আগে। তা না হলে কি করবে তারা? কোথায় যাবে? খাবে কি? এ-ত শেখপুরা নয়, এ আজব সহর কলকাতা! এই যে এত লোক সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, একবার জিজ্ঞাসা করলো না, তোমরা

খেয়েছ ? মামার বাড়ি কথা জিজ্ঞাসা করলে আমোলই দেয় না। এরা শুধু মজা দেখতে চায়।

এপাশে ওপাশে কত বাড়ি খোঁজ করলো, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলো! রাস্তা পার হয়ে হয়ে গায়ে ব্যথা হয়ে গেল। সূর্য্যদেব মাথার উপর উঠলেন, তবুও সন্ধান মিললো না। রোদ্দুরের তাপে মাথা ঝম্‌ঝম্ করছে, পেট মোচড় দিচ্ছে খিদের জ্বালায়; সকাল থেকে একটি দানা পেটে পড়েনি। বেবীর মুখ শুকিয়ে আমসী, গায়ে হাত দিলে মনে হয় জ্বর হয়েছে।

সামনে একটি বাগান দেখা গেল রেলিং দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে সুন্দর পুকুর। বাগানে ঢুকে একটি বড় গাছের ছায়ায় ঝুপ্‌ঝুপ্ সব বসে পড়লো। পিছনে যারা আসছিল; সেই সব লোকেরা ভাবলো এইবার খেলা আরম্ভ হবে। তারাও ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়লো ঘাসের উপর।

রাগে, দুঃখে, কষ্টে, চোখে জল এসে যায়। আমরা মরে যাচ্ছি আর লোকেরা মজা দেখছে! একবার মনে হয় টিপুকে লেলিয়ে দেওয়া যাক। আঁচড়ে, কামড়ে, তাড়িয়ে লোকগুলিকে উচিত শাস্তি দেবে। আহা, টিপু বেচারী জিভ বার করে কুকুরের মত হাঁফাচ্ছে! ও যে পশু, খেতে না পেলে ওর আরো বেশী কষ্ট হয়।

লোকেরা বসে বসে বিরক্ত হয়। নানা কথা বলতে লাগে, টিট্‌কারী দেয়, কেউ বা গালাগালিও দিয়ে ফেলে। টেনীরা উত্তর দেয় না কিছু। শেষে এক এক করে সব উঠে চলে গেল। পাশের গাছের তলায় আরেকজন লোক বসে জিরুচ্ছিল, পাশে একটি টুকরীতে

কাপড় ঢাকা কি ছিল! উঠে যাবার সময় টুকরী থেকে একটি বড় পাঁউরুটি বার করে টিপুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেও চলে গেল।

টেনীরা ভাবলো টিপু তিন কামড়ে শেষ করবে। করলো না তা। রুটিটা নেড়ে চেড়ে দেখে, জিভ দিয়ে ঠোঁট মুছে টেনীর কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এমন ভাল লাগলো টিপুর এই কাজটি যে লিখে বোঝানো যায় না! নিষ্ঠুর মানুষগুলোর তুলনায় কত দয়ালু এই গরিলা টিপু!

টেনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাগ করলো, বড় ভাগটি দিল টিপুকে। শুধু পাঁউরুটি, তাই সই; পেটের জ্বালায় বাচবিচার চলে না। খেয়ে, জল খেয়ে, পাশাপাশি শুয়ে সব ঘুমিয়ে পড়লো। সারাদিনের ক্লান্তি আর জেগে থাকতে দিল না।

ঘুম ভাঙ্গতে বিকাল হয়ে গেল।

টেনী বলে,—চল। আবার রাত্রি হ'লে খুঁজে আর পাওয়া যাবে না, তখন রাত কাটানো বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

বেবী বললো,—আর চলতে পারছি না দিদি, পা বড় ব্যথা করছে, খিদে পেয়েছে বেজায়।

লব-কুশেরও কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু বললো না কিছু! বলে কি হবে উপায় যখন নেই কিছু?

টেনী ভাবলো বেবীকে কোলে নিয়ে চলবে কিন্তু শক্তিতে কুলায় না। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর দুর্ব্বল হয়ে গেছে। টিপু চুপ্ করে দেখছিল এদের কাজ; টপ্ করে বেবীকে তুলে নিজের কাঁধে বসিয়ে

নিল। বেবী ভয় পেয়ে গিছলো ; শেষে দেখে মন্দ নয়, কাঁধে চড়ে যাওয়ায় আরাম আছে।

টেনী চলে আগে আগে, লব-কুশ তারপর, পিছনে টিপু—কাঁধে বেবী! সকালের যে সব লোক পিছু পিছু এসে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেছে, তারা কোথা থেকে দলবল নিয়ে এসে জুটলো। ভাবলো এই খেলা সুরু হয়েছে। হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগলো, কেউ বা দুষ্টামি করে পিছন থেকে ধাক্কা দিল টিপুকে, দু' এক টুকরা ইট-পাটকেল এসেও পড়লো।

টেনীরা পা' চালিয়ে হন্ হন্ করে চলতে লাগলো। টিপু এক-একবার রেগে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে দাঁড়ায়, লোকেরা হাউমাউ করে এ ওর ঘাড়ে পড়ে ছুটে পালায়। আবার যে কে সেই!

কত লোককে জিজ্ঞাসা করলো—রজনীবাবুর বাড়ি জানেন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ?

কেউ পারে না বলতে। সবারই এক কথা—বাড়ির নম্বর না হলে বলা যাবে না। এ যে কলকাতা সহর!

একটি চৌমাথায় এসে জিজ্ঞাসা করতে একজন লোক বললো,—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শেষ হয়েছে এখানে। ঐ দিকে খোঁজ কর।

আরে ঐদিক দিয়ে আগাগোড়া রাস্তাই ত' জিজ্ঞাসা করতে করতে এসেছে, বলতে পারলো না কেউ। আবার ফিরে একই পথে ঘুরে বেড়াবে! খোঁজ মিলবে কি ?

পিছনের লোকের দল ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। বিকালের দিকে কত লোক বেড়াতে বেরিয়েছে! ভাবলো,—মজা মন্দ নয়, কলকাতা সহরে

ছোট মেয়ে কাঁধে গরিলাকে চলতে দেখা যায় না,—একটু মজা করাই যাক। তাদের চীৎকার, হাততালি, দুষ্টামি—মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

টেনী চুপ করে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়—কোথায় যাবে? বেবী টিপুর কাঁধের উপর থেকে বললো,—ঐ দেখ দিদি—আমাদের সার্কাসের প্ল্যাকার্ড, আমাদের ছবিসুদ্ধ দেওয়ালে মারা।

টেনী দেখলো—সত্যি তাই। লব, কুশ, টিপুও দেখতে লাগলো।

একজন মস্ত গোঁফওয়ালা, লাল-পাগড়ি পুলিশ ভিড় ঠেলে এসে বলে,—এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় করা নিয়ম না। লোকজনের অসুবিধা হচ্ছে। খেলা দেখাতে হয় গড়ের মাঠে যাও, নয়তো ধরে থানায় নিয়ে যাবো।

এ' ত' বড় মুস্কিল! আজব সহর কলকাতায় আর কিছু না থাক, নিয়ম আছে অজস্র! বাগানে রাত কাটানো নিয়ম নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু ভাববারও নিয়ম নেই—ভাবলেই থানায় ধরে নিয়ে যাবে!

টেনী ঠিক করলো সার্কাসেই আবার ফিরে যাবে। উপায় কি? এত কষ্টের চেয়ে সেই ভাল। লব, কুশ, বেবীকে বলতে ওরাও রাজী তক্ষুণি। টিপু? টিপুর এখন খেতে হবে পেট ভরে, তা সে যেখানেই হোক রাজী।

একজন ভাল লোককে প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে টেনী জিজ্ঞাসা করলো,—ঐ সার্কাস কোন্ দিকে।

লোকটি বললো,—খুব কাছেই, আমি ঐদিকে যাচ্ছি, সঙ্গে এস।

পিছনের দল মন্তব্য করে,—সে' ত' জানতামই গোড়া থেকে সার্কাসের খেলা দেখাবে ; মিছামিছি আমাদের ঘোরালে। চল চল, সার্কাসেই যাই।

টেনীরা লোকটির সঙ্গে চললো। রাস্তার ধারে একটি গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো পাঁচবার।

চৌদ্দ

বাঘ-সিংহের মুখে

ঠিক ছ'টার সময় সার্কাস আরম্ভ হ'ল। প্রথম 'শো'। সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়ে গেছে, কত লোক না পেয়ে ফিরে গেছে। চারিদিকে তাকালে শুধু মানুষের কালো মাথা থাঁকের পর থাক্ সাজানো। কত সেজে গুজে তৈরী হয়ে সকলে আনন্দ করতে এসেছে।

সার্কাস কলকাতায় বছরে একবার করে আসে, না দেখলে আর হ'ল কি ?

টেনীদের পিছনে পিছনে যারা এসেছিল, তারাও মিশে গেছে মানুষের সারির মধ্যে, এখন খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। তারা দেখলো সেই চারটি ছেলেমেয়েকে অন্য রকম দেখাচ্ছে সার্কাস করবার সময়। 'মেকাপ্' করে চেহারা বদলেছে, আর কি!

নিয়মমাফিক্ পরের পর খেলা চললো। কলকাতার লোকেরা দেখলো ছোট্ট মেয়ে বেবীর অদ্ভুত খেলা, চ্যাংএর সঙ্গে। দেখলো সেই যমজ ছেলে দুটি তারের উপর, ঝোলা দোলনার উপর কত কায়দাই না করলো—এলিজার সঙ্গে সঙ্গে। ছেলে দুটির হাব-ভাব, আদব-কায়দা—যেন এক ছাঁচে গড়া! কি অপূর্ব্ব শিক্ষা!

এ আবার কি! সেই গরিলা সাইকেল চালাচ্ছে ওদের সঙ্গে—একচাকার সাইকেল! এ গরিলা নয় কিছুতেই, মানুষ অমন সেজেছে। গরিলা সাইকেল চালাতে পারে অমন সুন্দর ভাবে? ঐ

ভাইবোন ছেলেমেয়েরা যেন একটি সূতোয় গাঁথা। কোন ভুলচুক হয় না। এ সার্কাস নয়, এ ম্যাজিক—এ রকম হয় কি করে ?

আর এই আম্বো-জাম্বো, পেটে খিল ধরিয়ে দেয়। বদমায়েশের রাজা! এত ফন্দিও মাথার ভিতর আছে! হো হো হো, হি হি হি, হা হা হা—ওরে বাবা আর পারিনে!

বড় মেয়েটি আবার ঘোড়ায় চড়ে, হাতীতেও চড়তে পারে। আরে পড়তে পড়তেও পড়লো না; ওটা—কায়দা। ঐ রকম ঐ লোকটাই ওকে শিখিয়েছে। কি নাম ঐ প্যাঁচার মত গম্ভীর মুখ—রজনীকান্ত। বাহাদুর মেয়ে বাবা, সাবাস খেলা—দৌড়ালো ঘোড়ার উপর 'ভলট' খেলো! হাততালি—আরো জোরে হাততালি দাও। অনেকদিন এমন সার্কাস দেখা যায় নি—স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

বাঘ-সিংহের খেলার আগে চন্দ্ররাও সামনে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। খুব চেঁচিয়ে বললো,—দেখুন, আপনাদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। প্রোগ্রামে দেখেছেন রমাবাই আশ্চর্য্য রোমাঞ্চকর খেলা আজ দেখাবে বাঘ সিংহদের নিয়ে; কিন্তু রমাবাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

শেষ করবার আগেই দর্শকরা ভীষণ চীৎকার করে বলে উঠে নানা গলায়,—ওসব চালাকি শুনবো না—খেলা আমাদের দেখাতেই হবে—ওস্তাদী পেয়েছ? পয়সা ফেরৎ দাও—বাঘ সিংহর খেলা আমরা দেখবই—নড়ছি না বাবা! সার্কাসে আগুন ধরিয়ে দেবো, আমরা কলকাতার ছেলে—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চন্দ্ররাও দু'হাত জোড় করে আকারে ইঙ্গিতে লোকেদের চুপ

করতে বললো। চীৎকার যেই একটু থেমেছে, খুব চেঁচিয়ে চন্দ্ররাও বলে উঠে,—বাঘ-সিংহের খেলা দেখানো হবে।

দর্শকরা 'বেশ' 'বেশ' করে—চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে শান্ত হ'ল।

চন্দ্ররাও বললে,—আমাকে কথা শেষ করতে দিন। রমাবাই অসুস্থ, সেজন্য তিনি খেলাটি দেখাতে পারবেন না। তাঁর বদলে আরেকটি মেয়ে খেলা দেখাবে। বয়সে এ অনেক ছোট, কিন্তু সাহসে কিছু কম নয়। আমার অবস্থা দেখে, দয়া করে নিজের ইচ্ছায় এই বিপজ্জনক খেলা দেখাতে রাজী হয়েছে।

চন্দ্ররাও কথা শেষ করে আবার অভিবাদন করলো, পরে হাতের ইঙ্গিতে খেলা সুরু করতে হুকুম দিল।

বাঘ সিংহের সঙ্গে খাঁচায় এসে ঢুকলো টেনী!—আগাগোড়া সোনালী পোষাক, লম্বা বেণীর শেষে বাঁধা সোনালী ফুল। এক হাতে চাবুক অন্য হাতে পিতলের লাঠি। ঢুকে মাথা নীচু করে 'বো' করে চামড়ার চাবুকে পটাস্ করে এক আওয়াজ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আলোতে টেনীর পোষাক ঝলমল্ করে উঠে।

এই দেখেই যেন সব পয়সা উঠে গেল লোকদের! চটাপট্ হাততালি আর সোল্লাসে চীৎকার! কানে তালা লাগিয়ে দেয়, অন্য কিছু শোনা যায় না।

সবশেষে চন্দ্ররাও এসে খাঁচার ভিতর এক কোণে দাঁড়ালো, আজ নিজেই পিস্তল নিয়ে। ছোট মেয়ে প্রথম দেখাচ্ছে কোন শিক্ষা না নিয়েই; যদি কোন বিপদ ঘটে, দায়িত্ব আছে। বাঘ-সিংহ আজ একটু বেশী গরম। সিংহের মেজাজ যেন বেশী খারাপ; ছট্‌ফট্ করছে,

একটুতে রেগে যাচ্ছে। নতুন জায়গায় খেলা দেখাবার সময় প্রত্যেক-বারই এমন হয়।

টেনী চাবুকের আওয়াজ ও মুখে শব্দ করে' করিয়ে যেতে লাগলো নিয়মমত খেলা। বাঘ-সিংহ কথা না শুনলে, দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এলে, পিতলের লাঠি দিয়ে ভয় দেখাতে লাগলো, আবার রমাবাঈ-এর মত মিষ্টি কথায় আদরও করলো। টেনীর ভয় করছিল না একথা বলা যায় না, কিন্তু সাহস ওর খুব। যখন ভার নিয়েছে, তখন শেষ করতেই হবে সুন্দর ভাবে এই ওর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

বাঘ সিংহ ছাগল এক সঙ্গে টেবিলে পা তুলে খেলে, এ ওর পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। ছাগলের পিঠে আগুনের রিং রেখে, তার ভিতর দিয়ে বাঘ দু'টি লাফিয়ে বারবার পার হয়ে গেল।

এবারে শেষ খেলা,—বাঘের মুখে হাত ঢোকানো, সিংহের হাঁ-এর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া।

ব্যাণ্ড বাজতে বাজতে থেমে গেল। চন্দ্ররাও নড়ে চড়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়ালো। টেনী বাঁ হাতে পিতলের লাঠি ও চাবুক নিয়ে এক এক করে ডানহাতটি বাঘেদের মুখে পূরে দিল; বাঘেরা ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে করতে হাঁ করে রইলো নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে।

সিংহ কিছুতেই হাঁ করবে না। কত সাধ্যি-সাধনা, তবুও নয় কিছুতে। পিতলের লাঠি মুখের কাছে নিয়ে যেতে এক লাফে চৌকি থেকে নেমে পড়ে ভীষণ আওয়াজ করতে লাগলো। মারতে হয়. দু'-তিন ঘা চাবুক, তবে চুপ করে। আবার সাধ্যি-সাধনা খোসামোদ, তবে চৌকিতে উঠে।

পিতলের লাঠি দেখিয়ে ভয় পাইয়ে হাঁ করানো হ'ল। টেনীর সমস্ত দেহ যেন একবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল, চোখদুটো সিংহের চোখে স্থির দৃষ্টিতে রেখে।

চন্দ্ররাও একবার ভাবলো, এ খেলা বন্ধ করে দি; কাজ নেই একটি ছোট মেয়ের জীবন বিপন্ন করে। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে চুপ্ করে রইলো; ওরা শুনবে না কিছুতেই। পয়সা যখন দিয়েছে, টিকিট কিনেছে, সবটুকু দেখে তবে ছাড়বে। তা না হলে সার্কাস পুড়িয়ে দেবে বলেছে।

ধীরে ধীরে টেনী নিজের মাথা সিংহের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। সোনালী ফুল লাগানো বেণীটি বাইরে ঝুলতে লাগলো। ব্যাণ্ড থেমে চুপ্ করে আছে। সমস্ত মানুষ নিস্তব্ধ জড়ের মত বসে দেখছে! কোথাও এতটুকু শব্দ নেই! দর্শকদের মনে হ'ল যেন সিংহের হাঁ আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে, মুখ বুজে আসছে—আর এক সেকেণ্ড বাদে ঐ বড় বড় চকচকে ধারালো দাঁত মেয়েটির গলা চেপে ধরবে। মনে হ'ল……

সমস্ত আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো,—দিদি, দিদি, দিদি!

এ বেবীর গলা! সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ দড়াম্ করে পিস্তলের আওয়াজ—একবার,—দু'বার!

সিংহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। বাঘদুটো ভয়ে লাফিয়ে কোণে গিয়ে দাঁড়ালো।

টেনী পাথরের মত দাঁড়িয়ে খাঁচার মাঝখানে,—ঠিক সময়ে নিজের মাথাটি বার করে এনেছে।

ওখানে কি হ'ল? দর্শকদের এক দিকে—'জল জল' করে অনেক লোক চেঁচাচ্ছে! বলছে,—সরে যান, সরে যান, হাওয়া ছেড়ে দিন, মূর্চ্ছা গেছে—জল জল!

ঐ দিক্ থেকে একজন বলিষ্ঠ লোক সকলকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এল, চীৎকার করে ডাকতে লাগলো,—টেনী, টেনী, বেবী, লব, কুশ!—এদিকে এস, এদিকে আমি, তোমাদের মামাবাবু!—

পনেরো

শেষ বেশ

শেষ হ'ল টেনী বেবীদের বাড়ি পালানোর কাহিনী, কিউলের মেলা দেখতে বেরিয়ে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের ইতিহাস। বাড়ি ফিরে এসেছে শেখপুরায়। সঙ্গে এসেছে একটি নতুন মানুষ! না না মানুষ নয়, গরিলা। মানুষের মতনই বুদ্ধি বটে।

বাবা-মা খোঁজাখুঁজি করতে করতে কলকাতায় গিয়ে উঠেছিলেন মামার বাড়িতে। সেই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। এ বাড়ির সামনে দিয়ে টেনীরা অভুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়েছে, জিজ্ঞাসা করে ফিরেছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। অথচ তিনতলার উপর মা বাবা বসে ভাবছিলেন ওদের কথা, মামাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন কোথায় সন্ধান করা যায়। এ শুধু আজব সহর কলকাতাতেই সম্ভব

কেঁদে কেঁদে মার শরীর মন দু'ই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মামাবাবু জোর করে সেদিন সার্কাস দেখতে নিয়ে যান, মন ভাল হবে ভেবে!

সার্কাসেও মা সারাক্ষণ কেঁদেছেন চুপ্ করে বসে। চারিটি ছেলেমেয়ের চলাফেরা, আকার-ইঙ্গিত,—সমস্ত তাঁর নিজের ছেলেমেয়ের মত কিন্তু দেখতে এরা অন্য রকম! কি অদ্ভুত, অবিকল সাদৃশ্য! খালি মনে পড়েছে টেনী-লব-কুশ-বেবীর কথা, আর কেঁদেছেন।

বেবী এককোণে বসে লব কুশের সঙ্গে দিদির বাঘ-সিংহের খেলা দেখ্‌ছিল, কিন্তু শেষে আর সহ্য করতে পারলো না। সিংহের মুখে

মাথা চোকানো আর সিংহের মুখ বন্ধ হয়ে আসছে,—কেঁদে চীৎকার করে উঠলো,—দিদি—দিদি—দিদি!

বেবীর ডাকই চিনিয়ে দিল, এরা কারা!

মার মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে, অপূর্ব্ব মিলন। হারানো কোলের ছেলে-মেয়েদের কোলে ফিরে পাওয়া গেল। চন্দ্ররাও ভয়ে এতটুকু! ঘোড়ার খুর গোঁফ আরো ঝুলে যায়।

টেনীর মামা রজনীবাবু পুলিশ ডাকতে ছোটেন। শেষে বুদ্ধিমান লব-কুশ চন্দ্ররাওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেয় এই সর্ত্তে যে, টিপুকে দিয়ে দিতে হবে।

প্রথমে রাজী হয় না কিছুতেই। শেষে রাজী হতে বাধ্য হয়। করে কি, বুড়ো বয়সে জেলে গিয়ে পচ্‌বে? রজনীকান্ত গা' ঢাকা দেয় তখনকার মত। কাজ কি? কি ফ্যাসাদে ফেলে দেবে, গোয়েন্দাগিরির শাস্তি দেবে হয়তো! আম্বো-জাম্বো এত খুশী যে পটাপট্‌ এ ওকে চড় মেরে মিছামিছি পড়ে যেতে লাগলো। মজা না?

টেনীরা শেখপুরায় ফিরে এসেছে। কথা দিয়েছে আর অমন করে পালাবে না,—যা ইচ্ছা হবে বলবে।

শেখপুরায় আজকাল মাঝে মাঝে একটি ছোট সার্কাসের খেলা দেখানো হয়, বিনা টিকিটে। এই সার্কাসের দলে ছ'জন খেলোয়াড়, ছ'জন মানুষ। টেনী—লব—কুশ—বেবী—টিপু—বিশুয়া!

ওঃ টিপু মানুষ নয় বুঝি—গরিলা? তা হ'লে তাই। কিন্তু ওর মানুষের মতনই বুদ্ধি।

শেষ

